পঞ্চ-প্রদীপ।

বা

(পাঁচটী নানাভাবপূর্ণ সুন্দর গল্প-কথা)

ক্যাক্‌টা, মল্লভূমি
বাঁকুড়া জেলা হইতে
শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার
কর্ত্তৃক

রচিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল, ১৫ই আশ্বিন।

কলিকাতা, ৬নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট ইডিন প্রেস হইতে
এস্, সি, বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ।



কুলের-তিলক, বংশের গৌরব,

৺ রজনীকান্ত সরকার,

যিনি বাঙ্গালা দেশের এক অন্ধকারময় পল্লীগ্রামে
একটী ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া
নিজ প্রতিভায় জন্মভূমির মুখ আলোকিত করিয়াছিলেন,
নিয়তির কঠোর বিধান উপেক্ষা করিয়া
যিনি বন্ধুহীন, অর্থশূন্য এই হতভাগ্যকে
কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন,

তাঁহার শ্রীচরণ-উদ্দেশে

আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
অর্পণ করিয়া
ধন্য হইলাম।

ইতি—

১৫ই আশ্বিন, ১৩১৯।
কাকৃট্যা, মল্লভূমি।

শ্রীগ্রন্থকার।

নিবেদন।

স্বর্য্যোদয় হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম না করিলে যাহার উদরান্নের সংস্থান হয় না, তাহার পক্ষে সাহিত্য-পথের পথিক হইবার আশা দুরাশা মাত্র। জানি আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা আমার মত লোকের পক্ষে বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তবুও আমি মানুষ। মানুষ আশার দাস।

পাঠকবর্গের প্রতি বিনীত নিবেদন, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনকালে আমাকে দারুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহার উপর সময়ের অত্যন্ত অভাব; সেইজন্য এই প্রথম সংস্করণে দুই একটী স্থানে দোষ রহিয়া গেল। সেজন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। যদি কখনও এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রাঙ্কনের উপযুক্ত বিবেচনা করি, কখনও পাঠকবর্গের নিকট সহানুভূতি পাইয়া অন্য নূতন পুস্তকে হাত দিতে পারি—তখন সে বিষয়ে যত্নবান্ হইব। নহিলে আমার এই প্রথম প্রয়াসেই আশার শেষ হইবে। আমার দোষের জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে জানাইতেছি যে, গ্রেট ইডিন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার পরম হিতার্থী শ্রীযুক্ত মনোহরচন্দ্র বসু যদি আমাকে সহোদরের মত ভাল না বাসিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক যে আরও কতকাল আমার ভাঙ্গা ঘরে পড়িয়া থাকিত তাহা জানি না।

ইতি—গ্রন্থকার।



পঞ্চ-প্রদীপ।

অভিসম্পাত।

"বৌদিদি! আর তুমি এত পরিশ্রম ক'র না। আয়নাটা নিয়ে একবার দেখ দেখি কি হ'য়ে গেছ?"

"ঠাকুরপোর ঐ এক কথা, আমি পরিশ্রম না ক'রলে—সংসারের কাজ কি ক'রে সব হবে?"

কেন বড় বৌদিদি ত র'য়েছেন, তাঁর ত দিব্যি শক্তি আছে, উনি কাজ ক'রতে পারেন না?"

"না ভাই ওঁর মাথার ব্যায়রাম আছে, কাজ করলেই সেই ব্যায়রাম বাড়ে, তা ছাড়া উনি কখনতো কাজকর্ম্ম করেন নাই, এত কাজ কি করতে পারেন?"

"উনি না পারেন একটা ঝি রাখা উচিত; তোমার কিন্তু এত পরিশ্রম সহ্য হবে না, তুমি আসন্ন-প্রসবা, মাঝে মাঝে অসুখ হচ্চে, তোমাকে বাঁচতে হবেতো।"

ভ্রাতৃজায়া নির্ম্মলা ও দেবর যতীন্দ্রের মধ্যে সন্ধ্যার সময় এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল,—এমন সময় বড় বধূ কিরণশশীর আগমনে তাহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। বোধ হয় তাহারা উভয়েই কিরণকে ভয় করিত, নইলে তাহাকে দেখিয়া তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইল কেন? পরস্পর ভয়চকিতনেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিল কেন? কিরণ বলিল, "ঠাকুরপোর বুঝি আর পড়া শুনা নাই!" এই কথা শুনিবা'মাত্র "ঠাকুরপো" প্রস্থান করিল, পরে নির্ম্মলার প্রতি চাহিয়া কিরণ বলিল, "মেজবৌ তোর বাপের বাড়ীর তত্ত্ব এসেছে দেখিছিস?"

নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বলিল, "দেখেছি।"

বড় বধূ বলিল, "মরণ—আর কি? একটু লজ্জাও হয় না, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এমন তত্ত্বও করে?"

নির্ম্মলার মুখখানি ম্লান হইল, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের উপর যেন একটা শিথিল মেঘ ভাসিয়া উঠিল। নির্ম্মলা বলিল, "দিদি, বাবা আর কোথা পাবেন?" তাহার কথা আর শেষ হইতে পাইল না, কিরণের আকস্মিক গর্জ্জনে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ আর শুনিতে পাওয়া গেল না।

কিরণ বলিল, "গয়না বিক্রী ক'রে—খেয়েই সব ফুরিয়ে দিয়েছে, তত্ত্ব করবার টাকাও আর নাই।"

নির্ম্মলা আর সহ্য করিতে পারিল না; অথচ কিরণের সম্মুখে কথা কহিবারও শক্তি নাই। সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

নির্ম্মলার এই নীরব প্রস্থানে কিরণের মন উঠিল না, কিছুক্ষণ তিনি আপন মনে কত কি বকিলেন। পরে আশৈশব পিত্রালয়-বাসিনী প্রৌঢ়া শ্যামার সহিত এই কথারই চর্ব্বিত চর্ব্বণে নিযুক্তা হইলেন। আমাদের সে গালাগালি শুনিবার অবসর নাই আর সখও নাই। যাহা ইচ্ছা তাঁহারা বলিতে থাকুন,—এই অবসরে নির্ম্মলার একটু পরিচয় দিয়া রাখি।

২

নির্ম্মলার পিতার নাম জগন্নাথ দত্ত। তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোক। পশ্চিম প্রদেশে ঠিকাদারী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সংসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র কন্যা নির্ম্মলা ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। তবে অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে দুই একটা উপসর্গ জোটে; তাঁহার বাড়ীতেও যে সেরূপ দু'একজন ছিলেন না, তাহা নয়।

নির্ম্মলার শ্বশুর ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয় বুদ্ধি করিয়া এক-কন্যার পিতাকে বৈবাহিক করিলেন। বিবাহের সময় তিনি পণগ্রহণের কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি বোধ হয় মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, এক নির্ম্মলা ভিন্ন দত্ত মহাশয়ের অন্য সন্তান নাই। তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রই (যিনি দত্ত মহাশয়ের জামাতা হইবেন) শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। যদি তিনি সেই সময় পণগ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় নির্ম্মলার অদৃষ্ট অন্য বর্ণে চিত্রিত হইত। নির্ম্মলার বিবাহের কিছুদিন পরে তাহার মাতৃদেবী স্বর্গলাভ করিলেন। পত্নীশোকে জগন্নাথবাবু অধীর হইয়া কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন। তিনি এই ঠিকাদারী কার্য্যে বিস্তর অর্থ ফেলিয়াছিলেন, সহসা

কার্য্য ত্যাগ করায় প্রায় সমস্তই নষ্ট হইল। কারবারী লোকমাত্রেই ঋণগ্রহণ করিয়া কারবার করিয়া থাকেন। জগন্নাথবাবুরও কিছু ঋণ ছিল। টাকা আদায় করিবার জন্য মহাজনেরা নালিশ করিল এবং বিষয় সম্পত্তি, এমন কি পৈতৃকবাড়ীখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আসল টাকা এবং তাহার সুদ কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া লইয়া জগন্নাথবাবুকে অব্যাহতি দিল। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তাহার পর এক বস্ত্রবিক্রেতা একখানি ১২০০৲ (বারশত) টাকার হ্যাণ্ডনোট আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন। তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আর তাঁহার বিষয় নাই, অর্থ নাই, এমন কি পৈতৃক বাসভবনখানি পর্য্যন্ত নাই,—যাহার দ্বারা তিনি এই ঋণ হইতে মুক্ত হন। এই মহাজন ও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল। নির্ম্মলা শুনিল বারশ টাকার জন্য তাহার পিতাকে কারাগার যাইতে হইবে। সে তাহার সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পিতার হস্তে দিল। পিতা কন্যার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

পুনরায় কার্য্য করিবার দত্ত মহাশয়ের আর শক্তি ছিল না। কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দিয়া আপনি এক আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে নির্ম্মলার শ্বশুরের মৃত্যু হইল। তিনি যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন নির্ম্মলাকে কেহ অলঙ্কারের কথা কিছু বলে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার বড় বধূ, বড় লোকের মেয়ে, ১০০৲ (একশত) টাকা বেতনের বড় বাবুর স্ত্রী, শ্রীমতী কিরণশশী অভাগিনী নির্ম্মলাকে সেই অলঙ্কারের জন্য মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিলেন। সে মর্ম্মবেদনা

নির্ম্মলা একদিন সহ্য করে নাই, প্রতিদিন—উঠিতে বসিতে, নির্জ্জনে এবং লোকসমাগমে তাহাকে সহ্য করিতে হইত। সংসারে শ্বাশুড়ী ছিলেন না, সুতরাং বড়বধূ গৃহিণী। কে তাহার কথায় উচ্চবাচ্য করিবে?

কন্যার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া হতভাগ্য বৃদ্ধ জগন্নাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না; এক সময়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এবার কন্যার জন্য অপরের আশ্রয়ে একটী সামান্য কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে কে কার্য্য দিবে! বিশেষতঃ তাঁহার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কেবল প্রবল কর্ত্তব্যের তাড়নায় আবার কার্য্য করিতে আসিলেন। কিন্তু অর্থ বড় দুর্লভ। শরীরের এক এক বিন্দু রক্তের মূল্য এক একটী পয়সা, তাঁহার আর রক্ত নাই, পয়সা কোথায় পাইবেন? কেবল অস্থি আর মাংস থাকিলে পয়সা পাওয়া যায় না। দিনকতক কর্ম্মের পর কর্ত্তাবাবু বলিলেন, "আপনার অবস্থা খারাপ হইয়াছে আর আপনার শক্তি নাই, আপনি যান, আমরা অন্য লোক দেখি।" হতভাগ্য বৃদ্ধের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি তথা হইতে বিদায় হইলেন, অনেক স্থানে চাকরী অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সকল স্থানেই সেই এককথা; শেষে বৃদ্ধ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে পুনরায় সেই আশ্রয়দাতা নিখিল বাবুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবন আজ শেষ হইল। অদৃষ্ট, তোমার গতি বড় বিবর্ত্তনশীল! কাহাকে কখন কোন্ পথে লইয়া যাও তাহা মানবের নর-চক্ষুর অতীত। এই জগন্নাথ একদিন কত লোক প্রতিপালন করিয়াছেন, কত আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়াছেন, কত নিরন্নের আহারের সংস্থান

করিয়াছেন, আর আজ তিনি তোমারই চক্ষে একমুষ্টি উদরান্নের জন্য,—বৃদ্ধবয়সে একটু আশ্রয়ের জন্য অপরের দ্বারস্থ। আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে বলি, "বিধাতা, তোমার রচনার বাহাদুরি আছে। যখন যাহাকে তোল, তখন উন্নতির একটী সোপান হইতে অপর সোপানে এবং তথা হইতে একটী একটী করিয়া উচ্চতম শৃঙ্গে লইয়া যাও, কিন্তু যখন ডুবাইতে আরম্ভ কর, তখন আর ভূপৃষ্ঠেও তাহার স্থান নাই, বোধ হয় পাতালেও তাহাকে স্থান দাও না। তোমার অন্ধ-নয়ন তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে পায় না, তোমার বধির শ্রবণেন্দ্রিয় সে হাহাকার শুনিতে পায় না।" আমি আবার বলি, "তোমার এ রচনার বাহাদুরি আছে"!

৩

পরের আশ্রয়ে থাকিয়াও, শক্তিবিহীন হইয়াও বৃদ্ধ জগন্নাথ মাঝে মাঝে কন্যাকে দেখিতে আসিতেন। তাহাকে ভূষণবিহীনা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন; কিন্তু নির্ম্মলা একদিনের জন্যও তাহার নির্য্যাতনের কথা বৃদ্ধ-উপায়বিহীন পিতাকে শুনিতে দেয় নাই। অলঙ্কারের জন্য কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, সমস্ত গৃহস্থের বিরাগভাজন ও ঘৃণার পাত্রী হইয়াছে, তবু সে পিতাকে দেখাইত যে শ্বশুরালয়ে খুব সুখে আছে। বোধ হয় এই অলঙ্কারের জন্যই সে স্বামীর সোহাগ পর্য্যন্ত হারাইয়াছিল।

কেন যে দেবেন্দ্র ইদানীং নির্ম্মলাকে ভালবাসিত না, তাহার কারণ বিশেষ জানিতে পারা যায় না। তবে বোধ হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া কিরণশশী তাহার উপর বিরক্ত, তাই তাহা এত অনাদর এত তাচ্ছিল্য। দেবেন্দ্র ভ্রাতৃভক্ত, কিন্তু প্রকৃত ভ্রাতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া যে স্ত্রীর প্রতি অসৎ ব্যবহার করিত তাহা বলিতে পারি না।

ভক্তি ভ্রাতা বা ভ্রাতৃজায়াকে নয়; ভক্তি অর্থকে নতুবা যে সহধর্ম্মিণী, তাহাকে কে সামান্য দুই একখানা অলঙ্কারের জন্য এত তাচ্ছিল্য করে?

বড় বধূ কিরণশশী বড়লোকের মেয়ে, সংসারের কাজকর্ম্ম কিছু জানিতেন না, বা জানিলেও করিতেন না। আজ মাথাধরা, কাল পেটের ব্যায়ারাম ইত্যাকার অসুখের দোহাই দিয়া তিনি সংসারের কার্য্য হইতে প্রায়ই অব্যাহতি পাইতেন।

এখন নির্ম্মলা আসন্নপ্রসবা, তথাপি তাহার নিস্তার নাই। এই অবস্থায় এত কার্য্য করিয়াও হাস্যময়ী নির্ম্মলার মুখ প্রস্ফুটিত শতদলের মত প্রফুল্ল, স্বামীর অনাদরেও স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী। সে অলঙ্কারের জন্য কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিরণ বড়লোকের মেয়ে, বড় লোকের স্ত্রী, একগা গহনায় অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেন, আর তাঁহার পার্শ্বে নিরাভরণা নির্ম্মলা হাসিমুখে বসিয়া থাকিত। যে প্রকৃত সুন্দরী তাহার আবার ভূষণের প্রয়োজন কি?

এস দেখি কিরণ! একবার অঙ্গরাগে দেহখানি রঞ্জিত করিয়া, কবরী হইতে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত অলঙ্কার-খচিত অঙ্গখান নীলাম্বরী শাটীতে অৰ্দ্ধাবৃত করিয়া নির্ম্মলার পার্শ্বে দাঁড়াও দেখি—তোমার কৃত্রিম বেশভূষা তাহার নিকট ম্লান হইয়া যাইবে। চম্পক-পুষ্পবিনিন্দিত তাহার কান্তি, অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখাবয়ব, আপাদবিলম্বিত তাহার ঘনকৃষ্ণ চিকুরকলাপ। নির্ম্মলার অঙ্গ-রাগের প্রয়োজন কি? তোমার ও ছাইভস্মগুলা উহার সম্মুখে আনিও না, নির্ম্মলার নির্ম্মাল্য নষ্ট করিও না।

৪

ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ জগন্নাথ অনেকদিন কন্যার খোঁজ লইতে পারেন

নাই। তাঁহার আর পথ চলিবার শক্তি নাই। কাজেই কন্যাকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। নিখিল বাবুর জামাতা তাঁহাকে দুইটী টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই দুইটী টাকায় একখানি সাড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া কন্যার বাড়ীতে পাঠাইলেন।

সেই দেড় টাকার কাপড় ও আট আনায় মিষ্টি দেখিয়া কিরণশশী সমস্ত গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ করিল এবং তাঁহাদের সম্মুখে নির্ম্মলার পিতার স্বর্গের পথ সুগম করিতে লাগিল। এই সংবাদ যে শুধু সে ক্ষুদ্রগ্রামখানির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল তাহা নহে, ইংরাজ কোম্পানীর ডাকযোগে সুদূর বিদেশে,—যথায় দেবেন্দ্র ৪০৲ টাকা বেতনের চাকরী করিতেন তথায় প্রেরিত হইল। বড় বধূর পত্র পাইয়া দেবেন্দ্র নির্ম্মলাকে কেবল এই কয়টী কথা লিখিয়া একখানি পত্র দিলেন—"নির্ম্মলা তুমি মর তাহা হইলে বোধ হয় আমি শান্তি পাইব।" নির্ম্মলা দেবেন্দ্রর পত্রের কিছু উত্তর দিল না। সে মনে মনে স্বামীকে শান্তি দিবার জন্য মৃত্যু স্থির করিল। তাহাকে মৃত্যুর জন্য অন্য কিছু করিতে হইল না। তাহার মৃত্যুর জন্য অহিফেন বা রজ্জুর প্রয়োজন নাই। তাহাকে যে পরিশ্রম করিতে হইত, তাহাতেই প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সম্ভব। সে এতদিন কেবল চেষ্টা করিয়া স্বামীর জন্য প্রাণটী কোনরূপে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। আজ স্বামীর কথায় নিভৃত কক্ষের অর্গল উন্মুক্ত হইল। সেদিন সে এত পরিশ্রম করিল যে সন্ধ্যার সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। বড় বধূ বলিলেন, "ও সব কিছু না, কেবল আমাকে কাজ করাবার ফন্দি।" কালী দাসী (ইনি ফুলশয্যার

দিনে বিধবা হইয়াছেন এবং তাহার পরদিন হইতে পিতার অন্নের সদ্ব্যবহার করিয়া ও গ্রামের লোকের সহিত ঝগড়া করিয়া সময় কাটান) বলিল, "জান না বৌদিদি ওসব এই যে কি বলে—খিটের না পিটের কি রোগ ঐ উল্‌বোনা ভাতারকে পত্র লেখার মত একটা ঢং এসেছে। তোমাদের মেজ বৌএর বোধ হয় একবার একটু ইচ্ছে হয়েছে"—এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নির্ম্মলার মূর্চ্ছায় বাড়ীর মধ্যে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। পাঠাগারে পাঠ-নিরত যতীন্দ্রের কর্ণে সেই শব্দ বাজিবা মাত্র সে ব্যস্তভাবে তথায় ছুটিয়া আসিল এবং নির্ম্মলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। প্রায় ১৫ মিনিট যতীন্দ্রের শুশ্রূষার পর নির্ম্মলার চৈতন্য হইল। সে দেখিল, যতীন্দ্র ব্যতীত তাহার নিকট কেহই নাই। বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বুঝিতে পারিল যে তাহারই কথা হইতেছে। অভাগিনী আর উঠিল না কেবল যোড়হস্তে দীননেত্রে ঈশ্বরকে বলিল, "ভগবান আর কেন, এইখানে যবনিকা ফেলে দাও।"

তার পর বিকম্পিত প্রাণের রুদ্ধ আবেগ তপ্তদীর্ঘশ্বাসে তরল হইয়া তাহার নয়নপ্রান্তে দেখা দিল।

নির্ম্মলার চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়া ক্ষণকাল পরেই যতীন্দ্র তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। এবার নির্ম্মলা কাঁদিবার সময় পাইল। স্বামীর পত্রখানির কথা মনে হইল। আর সে নয়নবারি থামিল না। উচ্ছ্বাসময়ী নদীর মত মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া ছুটিতে লাগিল। তবে কাঁদ নির্ম্মলা, কাঁদ! হায় অভাগিনী তোমার স্বামী আছে, পিতা আছেন, তবুও আজ তুমি

অনাথিনী! কে তোমার নয়নজল মুছাইয়া দিবে? তবে কাঁদ, যদি ভগবান্ ইচ্ছা করেন এ জল থামিবে—নহিলে কার সাধ্য?

৫

নির্ম্মলা কাঁদিতেছে, এমন সময়ে যতীন্দ্র পুনরায় তথায় উপস্থিত হইল। এই শত্রুপূর্ণপুরী মধ্যে সেই তাহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাহাকে জননী-মত ভক্তি করিত।

যতীন্ ডাকিল, 'বৌদিদি'!

তাড়াতাড়ি নির্ম্মলা মলিন অঞ্চলে মুখ মুছিল; কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যতীন্ বলিল "বৌদিদি তুমি কাঁদছ।"

নির্ম্মলা অতি কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিল "না কাঁদি নাই।"

যতীন—কাঁদ নাই বৌদিদি? তোমার চোখ যে ফুলে গেছে? মুখ যে লাল হ'য়ে গেছে? 'কেন বৌদিদি কাঁদচো?

নির্ম্মলা কথা কহিতে পারিল না।

যতীন্—তুমি কেঁদো না; প্রসব হলেই তোমাকে গিয়ে দাদার কাছে রেখে আসবো।

নির্ম্মলা আর পারিল না। তাহার সেই যুগ্মভ্রুবিশিষ্ট জল-ভারাক্রান্ত কাতর নয়ন যেন টল টল করিয়া উঠিল; বুঝি চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। যতীনও কাঁদিল। অনেকক্ষণ পরে নির্ম্মলা বলিল, ভাই তোমার আমার সমান কষ্ট। ঈশ্বরকে ডাকি তিনি আমাদের কষ্ট দূর করবেন।

ঈশ্বরের নাম শুনিয়া যতীন চমকিয়া উঠিল। নির্ম্মলার পানে চাহিয়া বলিল, "বলোনা বৌদিদি ওনাম মুখে এনোনা। সে তো সয়তান, ক্রুর। তার নাম করলেও লোকে কষ্ট পায়।"

নির্ম্মলা।—ছি ভাই ওকথা বল্‌তে নাই। আমরা নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করি; সে-জন্য তাঁর দোষ দেওয়া মহাপাপ। ঈশ্বর দয়াময়।

উত্তেজিতকণ্ঠে যতীন্‌ বলিল, "আমি বলছি ঈশ্বর তোষামোদী। তিনি যদি দয়াময় তবে তোমার এ কষ্ট কেন? তুমি তো কোন অপমানকে অপমান বলনি? আসন্নপ্রসবা তুমি, হাসিমুখে এত পরিশ্রম কর্‌ছ;—সতী তুমি! স্বামীর নিকট লাঞ্ছিত হয়েও তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি অটল তবু তোমার এত কষ্ট? আর ও সয়তানী, যে স্বার্থ ভিন্ন কিছু বোঝে না, পরের অনিষ্ট না কর্‌লে যে জলগ্রহণ করে না, একটী পয়সার জন্য যে লোকের বুকে ছুরি মার্‌তে পারে, তার এত সুখ, এত প্রভুত্ব? আমি আবার বলচি বৌদিদি "ঈশ্বর তোষামোদকারী", আর না হয়ে যদি তিনি দয়াময় হন, তবে তিনি নাই। তা'হলে আমি তাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করতে চাই না। এমন সময়ে কিরণের আকস্মিক গর্জ্জনে তাহাদের মুখের ঈশ্বর ভয়ে মুখেই লুকাইলেন। কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ্‌ মেজবৌ বেশ হয়েছিল, সেই সেদিন যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলাম সেই রাধিকা যেমন মূর্চ্ছা গিয়েছিলো তোরো ঠিক তেম্নিই হ'য়েছিল। বেশ শিখেছিস্‌!"

যতীন বা নির্ম্মলা তাহার কথার কেহই উত্তর করিল না।

কিরণ বলিল, "এখনতো হয়েছে। এবার ওঠো ভাত চাপাতে হবে; কুটনো কুটে আমার হাতে ব্যথা হয়েছে, আমি আর পারি না।"

নির্ম্মলা বলিল, "দিদি আজ আমার বড় মাথা ঘুরচে, আজ আমি আর পারবো না।"

নির্ম্মলার কথা শুনিয়া কিরণ একেবারে জ্বলিয়া গেল, বলিল—শরীর তো তোমার তিরিশ দিনই খারাপ হয়। সংসারে এত কাজ কে করে? তবে তোমার বাপকে কি সোয়ামীকে লেখ তারা একটা ঝি পাঠিয়ে দিক?

এই বলিয়া দাবার ঘোড়ার চালের মত একলাফে আড়াই ঘর চলিতে চলিতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কিরণ অন্তর্হিত হইল।

যতীন নির্ম্মলার চক্ষে জল দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিল না। আর অভাগিনী নির্ম্মলা অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, "ভগবান আর কেন, এইখানে আমার কষ্টের অবসান কর।"

৬

উক্ত ঘটনার দুই দিন পরে নির্ম্মলা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। নবকুমারের মুখ দেখিয়া অভাগিনী সব দুঃখ, সব জ্বালা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে ইচ্ছা হইল। একদিন দুইদিন করিয়া পুত্রটী সাতদিনের হইল।

বিধাতা ভাঙ্গা কপালই ভাঙ্গেন। তাঁহার চক্ষে নির্ম্মলার এ সুখ সহ্য হইল না। আটদিনের দিন অন্ধবিধাতা অভাগিনীর পুত্রটীকে গ্রাস করিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মলারও সুতিকা ব্যায়ারাম ধরিল। একদিন কাটিল, দুইদিন কাটিল, পাড়ার দুই একজন লোক কিরণকে ডাক্তার আনাইবার পরামর্শ দিল।

কিরণ বলিল, টাকা তো হাতে নাই, মেজ ঠাকুরপোকে লিখেছি। এই কথা নির্ম্মলা শুনিল। সে একবার দেবেন্দ্রকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। যতীন্ নির্ম্মলার পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইল এবং দেবেন্দ্রকে আসিবার জন্য

টেলিগ্রাম করিল। বৃদ্ধ পিতা জগন্নাথ কন্যার পীড়া শুনিয়া তথায় ছুটিয়া আসিলেন এবং ভাল ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অভাগিনীর জীবন-প্রদীপ তখন তৈলশূন্য কে তাহাকে রক্ষা করিবে? পুত্রের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে অভাগিনী স্বামীর একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি যতীনের নামে লেখা। দেবেন্দ্র লিখিয়াছে, "যতীন্! আমার বলিতে যা আছে তাই দিয়া তুমি নির্ম্মলাকে ডাক্তার দেখাইবে। এমন কি প্রয়োজন বিবেচনা করিলে আত্ম-বিক্রয় করিবে আমি গিয়া তোমার ঋণশেষ করিব। দেখো আমার নির্ম্মলা যেন অযত্নে পালায় না।"

নির্ম্মলা স্বামীর সেই পত্র দেখিল। "আমার নির্ম্মলা" এই দুইটী কথা হইতে আর চক্ষু ফিরিল না। শুষ্ক কপোল বহিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। সম্মুখে পিতা, নিকটে ডাক্তার, অভাগিনীর সংজ্ঞা নাই। নির্ম্মলা মনে মনে বলিল,—শেষ মুহূর্ত্তে আমি স্বামীর পূর্ণ ভালবাসা পাইয়াছি আর আমার মৃত্যুতেও দুঃখ নাই।

আবার তাঁহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার "আমার নির্ম্মলা" ভাল করিয়া দেখিতে গেল কিন্তু তাহার দৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, শেষে পত্রধৃত অবশ হস্তখানি তাহার বুকের উপর পড়িল। সব শেষ হইল—"নির্ম্মলা মরিল।" মরিল কি? না সে শান্তি পাইল। তাহার জীবনব্যাপিনী জ্বালা আজ শেষ হইল। সে জুড়াইল। জ্বলিল কে?—বৃদ্ধ হতভাগ্য জগন্নাথ।

পাঠক একবার দেখ! ওই দূরে, মৃত্যুর মহিমময়ীর মহিমাময়ী নির্ম্মলা। ওই দেখ, তাহার স্খলিতকুন্তলমধ্যে সিন্দূরের ঔজ্জ্বল্য। ওই দেখ তাহার মুখমণ্ডল মৃত্যুতেও কেমন দীপ্তিমান্, ওষ্ঠাধর কেমন হাস্যযুক্ত; আর তাহার পার্শ্বে হতভাগ্য জগন্নাথ।

কন্যার ললাটে করদ্বয় রক্ষা করিয়া কেমন স্থির! দৃষ্টি কি উদাসভাবপূর্ণ! কি গভীর দীর্ঘশ্বাস! কি ঘন-কম্পিত বক্ষস্থল! ওই আগ্নেয় গিরি ফাটিল। ওই হাহাকারে দিগন্ত পূর্ণিত হইল, নয়নসলিলে মৃতকন্যার মুখমণ্ডল সিক্ত করিল। তাহার পর আবার স্থির।

কতকগুলি লোক আসিয়া নির্ম্মলার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল। আবার সেই হৃদয়-বিদারক হাহাধ্বনি উঠিল। ওই বুঝি সে করুণ-দুঃখে পৃথিবী ফাটিয়া যায়।

৭

নির্ম্মলার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র বাড়ী আসিল। সে যাহাই হউক মানুষ পিশাচ নয়। তাহার মনুষ্যত্ব আছে। পত্নীর মৃত্যুতে সে খুব কাতর হইল। একদিন সে বিষণ্ণভাবে বসিয়া ছিল আটদশটা স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে অর্দ্ধ চক্রাকারে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে ছিল।

কিরণ বলিল—এমন তো অনেকেরই হয়, তার'জন্য আর না খেয়ে সারাদিন চুপ করে বসে থাকলে কি হবে। আবার ভাল বৌ আনবো। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি তুমি সুখী হবে।

ঠিক এই সময় কি একটা বিকট শব্দ হইল। সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল উন্মত্ত জগন্নাথ তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।—তাহার পশ্চাতে যতীন্দ্রনাথ।

জগন্নাথ তীরবেগে তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ? আর আমার? কে নেবে? কে সহ্য করতে পারবে? এসো, এসো, আপন আপন বুক দিয়ে সংসারটা ছেয়ে ফেল। তোমরা আমার সোণার প্রতিমাকে পুড়িয়ে ছাই

করে দিয়েচো, ছাই ভস্মে তোমাদের সংসার আবৃত হয়ে যাক্। আমার অভিসম্পাতে ভৈরবভ্রূকুটী শীঘ্রই এই স্থানে একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিয়ে দেবে।"

উপস্থিত সকলেই চক্ষু নত করিয়া ছিল, বৃদ্ধের দিকে চাহিতে কাহারো সাহস হইতে ছিল না। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শেষ হইবার পর সকলেই ত্রস্তে সম্মুখে চাহিল। কিন্তু সে তখন অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার অভিসম্পাতের বিভীষিকাময়ী প্রতিধ্বনি তাহাদের চারিদিকে অলক্ষে আস্ফালন করিতে লাগিল।





মিলন।

১

পৌষ মাস। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। একটি ছোট নদীর উপর একখানি দ্বিতল অট্টালিকার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া একটি বিংশবর্ষীয় যুবক পাঠে নিমগ্ন। তাহার সম্মুখে একটি দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছিল। দেওয়ালগিরি বলিতে কেহ যেমন বিবিধচিত্র-সুশোভিত, বসাকাচের ফানুষবেষ্টিত, ডবল শিখাযুক্ত মূল্যবান আলোকাধার মনে করিবেন না। এক সময়ে উহার মূল্য চারি টাকা ছিল কিন্তু আজ সে বিগত বৈভব উপায় বিহীন বৃদ্ধের মত,—পথে ফেলিয়া দিলেও কেহ লইবে না। তাহার নিম্নে দুইটী পার্শ্বে পাঁচটী তালি দেওয়া এবং ফানুষটির পটী দিয়া এমন অবস্থা হইয়াছে যে সেইটী কাচের কি কাগজের ফানুষ তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারা যায় না।

এই আলোকটী সম্মুখে রাখিয়া যুবক একমনে পুস্তক পাঠ করিতেছিল। একে পৌষ মাস তাহাতে আবার কয়েকদিন হইতে বাদলা হওয়ায় শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতেও দেখিতেছি অধ্যয়নরত যুবকের ললাটে শুভ্র মৌক্তিকের ন্যায় কয়েকটী ঘর্ম্মবিন্দু। একি! এ প্রবল শীতে যুবকের ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা যায় কেন? তবে কি সে পাঠে ডুবিয়া গিয়াছে?

তাই কি এই দারুণ শীতের পরাক্রম বুঝিতে পারে নাই? যুবক! ধন্য তোমার সাধনা, এ কঠোর সাধনায় সিদ্ধি অবশম্ভাবী।

ক্রমশঃ আলোকের জ্যোতি হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হয় তৈলাধার শূন্য হইয়া আসিয়াছে, তবে তো যুবকের সাধনার বিঘ্ন হইবে? তবে তো ধ্যান ভঙ্গ হইবে? হায়! যদি সাধনার অন্তরায় না থাকিত তবে বোধ হয় অনেকেই সাধক হইতে পারিতেন।

আলোকটা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। যুবকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষের সম্মুখে গিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহই তাহার কথার উত্তর দিল না। অনেক ডাকাডাকির পর রুক্ষস্বরে কে বলিল, "লোকের একটু ঘুমাবারও যো নাই; কেন, কি হয়েছে?"

যুবক বলিল, "আমার আলোতে তেল নাই, আপনার আলোটা একবার দিন।"

সেই ব্যক্তি গৃহের মধ্য হইতেই বলিল, "কে এ শীতে গায়ের ঢাকা খোলে? আমি পারবোনা; আর পড়ে না, শোও গে।"

হায় স্বার্থপর জীব! তোমার মনে কি একটুও সহানুভূতি নাই? একজন এই রাত্রে নিজব্রত সাধনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে আর তুমি একটু শীতের ভয়ে একবার দরজা উন্মুক্ত করিতেও কাতর?

যুবকের আর রাত্রে পড়া হইল না। ক্ষুণ্নমনে বিছানায় শুইয়া পড়িল। এমন সময়ে মৃদুস্বরে কে ডাকিল "প্রভাত"।

যুবক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "সুরো! এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?

সুরবালা বলিল, "তুমি ডাকছিলে?"

প্রভাত।—"আমি তো তোমাকে ডাকি নাই? আমার আলোতে তেল ছিলনা ব'লে সরকার মহাশয়কে ডাকছিলাম।"

সুরবালা।—আলো পাওনি?

প্রভাত।—না, তিনি দরজা খুলে দিলেন না।

সুরবালা।—তুমি ঘুমিয়ে পড়োনা আমি আস্‌ছি।

এই বলিয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা সুরবালা ছুটিল। একটু পরে একটী বাতি আনিয়া বলিল, "এই নাও, পড়; তুমি আমাকে বলনি কেন, আমি তোমাকে বাতি বা তেল এনে দিতাম।"

প্রভাত।—তুমি যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে বাতি দিবার জন্য জেগে ব'সে আছ তা কে জানে?

সুরবালা।—আমরা তো এখনো শুই নাই। মা এই খেতে বসেছেন, আমি তাঁর কাছে ব'সে ছিলাম, তোমার ডাকাডাকি শুনে এলাম।

প্রভাত মনে মনে বলিল, "তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো না।" প্রকাশ্যে বলিল, "যাও শোওগে

"তুমি পড়"—এই বলিয়া বালিকা চলিয়া গেল। যুবক আবার পড়িতে বসিল।

২

দরিদ্রের গৃহে প্রভাতের জন্ম। শৈশবেই হতভাগা পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। সংসারে বিধবা জননী ভিন্ন আর অপর কেহ ছিল না। তিনি কষ্টে স্বষ্টে কোন মতে দিনপাত করিতেন।

বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা উকীল, মহিমচন্দ্র ঘোষ প্রভাতের পিতার

বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই গৃহে থাকিয়া প্রভাত লেখা পড়া করিত। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী যামিনীও তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। সর্কলের অধিক মহিমবাবুর কন্যা সুরবালা তাহাকে জ্যেষ্ঠের মত ভালবাসিত। তাহার জন্য প্রভাতকে কোন জিনিসের জন্য কষ্টবোধ করিতে হইত না। সকাল ছয়টার সময় প্রভাত যখন পড়িতে বসিত, সুরবালা চায়ের পিয়ালা হাতে লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইত। তাহার স্নান করিবার পূর্ব্বে পাচকের সহিত সুরবালার প্রায়ই ঝগড়া হইত। বিদ্যালয়ের কঠোর পরিশ্রমের পর প্রভাতের যখন বাড়ী আসিবার সময় হইত, বালিকা আসনের সম্মুখে খাবারের পাত্রটী নামাইয়া পথপানে চাহিয়া থাকিত। প্রভাতও তাহাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করিত, নহিলে এত ভালবাসা কি করিয়া পাইবে?

মহিমবাবুর একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম, জীবনচন্দ্র। জীবনবাবু বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। সুতরাং কোন কাজ-কর্ম্ম করিতেন না। তিনি ধূমপানে, মাদক-সেবনে, এবং বারনারী-সেবায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বর্দ্ধমানের মত নগরে এই সব বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনিও প্রভাতকে মাঝে মাঝে ভালবাসিতেন। যখন তামাক সাজিবার প্রয়োজন হইত কিম্বা অঙ্গসেবার দরকার হইত, তখন তিনি তাহার গায়ের ও পায়ের মাপ লইতেন কিন্তু মাপ লওয়া পর্য্যন্তই হইত কার্য্যে বিশেষ কুলাইত না। সে জন্য প্রভাত কখনো অসন্তুষ্ট হয় নাই, সে জানিত মহিমবাবু তাহার যে উপকার করিতেছেন জীবন দিলেও তাহার পরিশোধ হয় না।

এইরূপে প্রভাতের দিন চলিতে লগিল, ক্রমশঃ তাহার

নির্ব্বাচনী পরীক্ষার সময় হইয়া আসিল। এই পরীক্ষার পর তাহাকে প্রবেশিকাসমুদ্রে দাঁড়াইতে হইবে। এখন সে পরীক্ষায় পাশ করিবার কথা তত ভাবে নাই, তবে একটা চিন্তা-ঝড় তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়া ছিল। তাহার ফিয়ের টাকা কে দিবে? দুই এক টাকার কথা নয়, যে মহিমবাবুর নিকট চাহিয়া লইবে দশটী টাকার প্রয়োজন। মহিমবাবু তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন সে জানিত তিনি তাহাকে এই টাকা দিবেন কিন্তু চাহিবে কিরূপে।

নির্ব্বাচনী-পরীক্ষা দিয়া প্রভাত প্রথম স্থান অধিকার করিল।

বেলা ১০৷৷টার সময় জীবনবাবু আহার করিয়া বাহিরের গৃহে শয়ন করিলেন। অতিরিক্ত বেলায় আহার করিয়া ভাত হজম হইবে না বলিয়া বোধ হইল। তিনি প্রভাতকে একটা সোডা আনিতে বলিলেন। প্রভাত সোডা আনিয়া দিল তিনি তাহা পান করিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বলিলেন। প্রভাত এইবার আপনার কথা উত্থাপন করিবার সময় পাইল। সে জানিত জীবনবাবুর হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে, সে সমস্তই উনি বাজে নষ্ট করিতেছেন আর তাঁহার এত প্রয়োজনেও কি ১০৲টা টাকা দিবেন না। তাই সে কথাটা তুলিতে সাহস করিল।

জীবনবাবুই অগ্রে কথা তুলিলেন, তিনি বলিলেন, প্রভাত তোমার পরীক্ষার খবর পেয়েছ?

প্রভাত,—হাঁ আমি প্রথম হয়েছি।

প্রভাতের কথা শুনিয়া জীবনবাবু আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন বা বেশফলত করেছ।

প্রভাত বলিল,—কিন্তু আবার একটি গোলযোগে পড়েছি।

জীবন,—গোলযোগ আবার কি?

প্রভাত,—ফিয়ের জন্য ১০৲টা টাকা চাই—কোথায় পাইব তাই ভাবছি।

জীবন,—তার জন্য আবার ভাবনা কেন? জীবনবাবুর কথা শুনিয়া প্রভাত খুব আহ্লাদিত হইল, আহ্লাদে ও আশায় তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই জীবনবাবু বলিলেন তুমি দাদাকে বল এখনি দেবেন। তাহার শেষ কথাটী প্রভাতের আবেগ-কম্পিত-বক্ষে একটি ধাক্কা লাগিল; একটুকু পরে সে বলিল, যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করেন—

জীবনবাবু তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, আমি! আমার হাতে এখনত টাকা নাই।

প্রভাত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশপানে চাহিল। মানব, যদি দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ বুঝিতে পারি, যদি মানুষ হইয়া মানুষের বেদনা অনুভব করিতে শিক্ষা করিয়া থাক, তবে দেখ,—ওই যে দীর্ঘনিশ্বাসে স্তব্ধসমীরণ কম্পিত হইয়া উঠিল, ওই যে একত্রীভূত-বায়ু চূর্ণ হইয়া গেল দেখ তাহার উপর স্পষ্টাক্ষরে কি লিখিত রহিয়াছে। —

"অভাগা চাহিলে হায়।
সাগর শুকায়ে যায়।"

হতভাগার দীর্ঘনিশ্বাস বাতাসেই মিশিয়া গেল। কেহ দেখিল না। জীবনবাবু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "তুমি যাও আমার ঘুম পেয়েছে।"

হায়! ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি টাকা লইয়া খেলা কর! পথে টাকা ছড়াইয়া যাও! বারাঙ্গনার কণ্ঠস্বরে তোমার সেই ভাণ্ডারের

অর্গল আপনা হইতে খসিয়া পড়ে, তেলামাথায় তেল দিতে তোমার অর্থ আকাশে উড়িয়া আসে, আর দরিদ্রকে সাহায্য করিবার সময় পৃথিবীর অভাব আসিয়া তোমাকে ছাইয়া ফেলে, তখন তোমার একটি পয়সার মূল্য অনেক বেশী। অনাথ দরিদ্রের প্রয়োজনে তোমার দৃঢ়মুষ্টি আরোও দৃঢ়তর হয়।

প্রভাত উঠিল, ছল ছল চক্ষে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। এমন সময় সুরবালা আসিয়া বলিল, "প্রভাত তোমাকে মা ডাকচেন।"

প্রভাত একদিনের জন্যও সুরবালার প্রতি বিরক্ত হয় নাই। আজ একটু বিরক্ত হইল এবং প্রবল অনিচ্ছাসত্বেও সুরবালার মাতার নিকট গমন করিল।

সুরবালার মাতা যামিনীদেবী বলিলেন,—বাবা প্রভাত! তোমার টাকার দরকার তো আমায় বলনি কেন?

প্রভাত কথা কহিতে পারিল না।

তুমি পরীক্ষায় সকলের উপর হয়েছো শুনে, আমি খুব খুসী হয়েছি। এই নেয় তোমার ফিয়ের টাকা। এই বলিয়া তিনি প্রভাতের হাতে ১০৲টি টাকা দিলেন।

টাকা হাতে করিয়া প্রভাত আর দাঁড়াইতে পারিল না। অতিরিক্ত আনন্দে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল সে বসিয়া পড়িল।

যামিনী বুঝিলেন,—অতিরিক্ত আহ্লাদে প্রভাতের মাথার ঠিক নাই। তিনি তাহাকে কোলে করিয়া মুখে ও মাথায় জল দিলেন। একটু পরে প্রভাত ডাকিল "মা"।

প্রভাত পরদিনেই বুঝিতে পারিল জীবনবাবুর সহিত তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা সুরবালা জননীর নিকট বলিয়াছিল। সে মনে মনে বালিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যামিনী দেবীর দান নিষ্ফল হইল না। প্রভাত পরীক্ষায় সমগ্র ছাত্রমণ্ডলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। তাহা মহিমবাবু শুনিলেন, যামিনী দেবী শুনিলেন, আনন্দময়ী সুরবালাও শুনিল, শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল।

আর প্রভাত সেই সংবাদ পাইয়া জননীর পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া, মহিমবাবুর ও যামিনীদেবীর চরণ বন্দনা করিল।

আর প্রভাতের হতভাগিনী বিধবা জননী! আজ তুমি কত সুখী। তুমি কত ভাগ্যবতী, যাহার কাছে যাইতেছ; তাহারি মুখে পুত্রের গৌরবের কথা শুনিতেছ। তোমার ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

প্রভাত বর্দ্ধমানে আসিলে অনেকেই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল। সকলের সহিত দেখা করিবার পর কামিনীদেবী তাহাকে আহার করিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বাসায় আসিয়া অবধি প্রভাতের সহিত সুরবালার দেখা হয় নাই। আহার করিতে আসিয়াও সে তাহাকে দেখিতে পাইলনা। সরল স্নেহময় যুবক কামিনীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরো কোথায়?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কি জানি বোধ হয় ঘুমিয়েছে।"

প্রভাত আশ্চর্য্য হইল। একি? যে সুরবালা প্রভাতের কাছে ছায়ার মত থাকিতে ভালবাসিত, প্রভাতের একটু প্রশংসা শুনিলে উৎফুল্লপ্রাণে তাহাকে সংবাদ দিতে আসিত, আজ তাহার এত সুখের দিনে সেই সুরবালা কোথায়।

প্রভাতচন্দ্র আসিয়া আহার করিয়া নীচে আসিবার জন্য উঠিল। দীর্ঘ দরদালান পার হইয়া সিঁড়িতে পা দিল, এমন

সময়ে সুরবালার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রভাত চন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক সেই সময়ে সুরবালাও উপরে উঠিতেছিল, সে একেবারে আসিয়া প্রভাতের সম্মুখে পড়িল। তাহাকে দেখিবামাত্র কিশোরীর সুন্দর মুখখানি গোলাপ ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। একবার সে পলাইবে মনে করিল, কিন্তু পলান হইল না। ভাবিল পলাইলে প্রভাত কি মনে করিবে?

অথচ গাম্ভীর্য্যটিও রহিল না। কিশোরী লজ্জাবনত মুখখানি ফিরাইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাত ভাবিল, বোধ হয় সুরবালা তাহার উপর রাগ করিয়াছে, তাই কথা কহিতেছে না। উদার বিংশবর্ষীয় যুবক ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরীর হস্ত ধারণ করিয়া ডাকিল "সুরো?"

সুরবালা কথা কহিল না। তাহার মুখখানি আরো লাল হইয়া গেল, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল।

প্রভাত আবার জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি রাগ করেছ?

সুরবালা আর দাঁড়াইল না। তাড়াতাড়ি প্রভাতের হাত ছাড়াইয়া পলাইল।

সুরবালা পলাইল কেন? সরলা কিশোরীর এত লজ্জাই বা কি জন্য? তবে বোধ হয় যামিনীদেবী ও মহিমবাবু তাহার সহিত প্রভাতের বিবাহ দিবার কথা কহিতে ছিলেন, তখন সে শুনিয়া থাকিবে। তাই এত লজ্জা। সুরবালা উপরে যাইলে যামিনীদেবী তাহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সুরো তোকে প্রভাত ডাক্‌ছিল যা কি বল্‌চে শুনে আয়।

সুরবালা কথার উত্তর না দিয়া মুখ নামাইয়া একেবারে গিয়া ছাদে উঠিল।

প্রভাত এই নূতন সংবাদ কিছুই শুনে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, সুরবালা তাহার সহিত কথা কহিল না কেন? সুরবালাকে দেখিয়া তাহারও মনে যেন একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। যথায় উদারতা ছিল, তথায় সঙ্কীর্ণতা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। সুরবালার একটা নূতন ছবি তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া গেল এবং সেই সময় হইতে তাহার মনে যেন একটা অপরিচিত ভাবের উদয় হইল। প্রভাত বুঝিতে পারিল না, এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আর কিশোরীর সেই লজ্জাবনত মুখখানি, শঙ্কিত, কম্পিত ও চঞ্চলতাপূর্ণ গতি তাহার মন হইতে মুছিল না। ধন্য প্রজাপতি ঠাকুর, কেমন দুইটী নিরীহ জীবের নয়নের সম্মুখ হইতে উদার অমুদ্বেলিত সারল্যপূর্ণ-দৃশ্য-পটখানি অপসারিত করিয়া সহসা একটা নূতন ছবি আনিয়া দিলে, তোমার কিছু কিছু বাহাদুরি আছে, নতুবা যিনি তোমার বিধাতা তিনি তোমাকে সুধু আহারের সুবিধার জন্য চারিটি বদন দান করিয়াছেন কি? দেখ, প্রজাপতি ঠাকুর, একটা কাজ কর দেখি, ঐ যে কিশোরী অন্তঃপুরের রেখা পার হইয়া চতুর্দ্দশে প্রবেশ করিবার জন্য অলক্ত-রঞ্জিত চরণখানি তুলিয়াছেন, যিনি গল্পটী পড়িতে পড়িতে একটু একটু হাসিতেছেন এবং মুক্তাবিনিন্দিত দন্তপংক্তিদ্বারা অধর টিপিয়া, নাসিকাবিলম্বিত মুক্তাটি নাড়িয়া ললাটের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চূর্ণকুন্তলগুলি সরাইয়া তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার পাঠে মনঃ সংযোগ

করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা উপায় করিয়া দাও দেখি। তাহা হইলে নববিবাহিতার অলঙ্কার-শিঞ্জিনীতে তোমার বিজয়বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইবে।

যথাসময়ে প্রভাতচন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিল। প্রথম মাসের বৃত্তি ২০৲ কুড়ি টাকা পাইবামাত্র জননীকে ৭৲ সাত টাকা পাঠাইয়া দিল। সেই মাস হইতে সে নিয়মমত মাসিক সাতটি করিয়া টাকা তাহার মাতাকে পাঠাইয়া দিত। এইরূপে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

বাল্য-প্রণয়ের উপর বিধাতার অভিসম্পাত আছে। বাল্য-কালে অনেকে অনেককে ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু সকলেই সকলকে পায় কি? যদি পাইত, তাহা হইলে সংসার স্বর্গ হইত। প্রভাতের কলিকাতা যাত্রার কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ মুঙ্গেরের অবিবাহিত যুবক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গেল।—সে ডেপুটীর স্ত্রী হইল। প্রভাতের মনের আশালতিকা অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া গেল।

সুরবালার সহিত বিবাহ হইল না বলিয়া, প্রভাতের প্রাণে একটা আঘাত লাগিয়াছিল কিন্তু তাহাতে উদ্যমবিহীন হইল না। পরবর্ত্তী এফ, এ; বি, এ; এম, এ; পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মানে ভূষিত হইয়া কর্ম্মবীর সাধক প্রভাতচন্দ্র সাধনার পরকাষ্ঠা দেখাইল। কঠোর সাধনায় সে সিদ্ধিলাভ করিল।

এই ছয় বৎসর সময়ের মধ্যে প্রভাতের বুকে আর একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার মাতৃদেবী তাহাকে সংসারে একা রাখিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। সংসারে কোন্

স্ত্রীলোক ছিলনা বলিয়া এবং মনের দারুণ অশান্তিবশতঃ প্রভাত-চন্দ্র বিবাহ করে নাই। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলেই সে কথাটা উড়াইয়া দিত। প্রথম কলিকাতা আসিবার পর হইতে সে বর্দ্ধমান আর যায় নাই, সুতরাং মহিমবাবু, যামিনীঠাকুরাণী কিম্বা সুরবালার সহিত তাহার দেখা হয় নাই। তবে পত্রাদিদ্বারা সংবাদাদি লইত। মহিমবাবু বা যামিনীঠাকুরাণী বিবাহের কথা লিখিলে প্রভাত উত্তর দিত, কিছুদিন পরে বিবাহ করিব। তাহার বিবাহ না করিবার যথার্থ কারণ কেহ জানিল না, জানিল একজন—সে "সুরবালা"। প্রভাত বিবাহ না করায় সে মনে আঘাতও পাইয়াছিল। সে ভাবিত আমি তাহার জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিলাম। এই সময় সুরবালার স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া আসিলেন। তাঁহার একবার কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন হইলে সুরবালা প্রভাতকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার হাতে দিল এবং যে কোনরূপে প্রভাতকে বর্দ্ধমানে আনিবার হুকুম জারি করিল।

সে পত্রখানিতে লিখাছিল :—

"প্রভাত দাদা! তোমাকে আগে প্রভাত বলিয়া ডাকিতাম, কিন্তু এখন তুমিও বড় হয়েছ, আমিও বড় হয়েছি, শুধু নাম ধরে ডাকিতে লজ্জা করে, তাই প্রভাত দাদা লিখিলাম।

দাদা! তোমার নিকট আমি কি অপরাধ করেছি, কাছে থাকিয়াও একবার দেখা করিতে সময় পাওনা। এত পড়ায় ব্যস্ত তুমি? আজ তুমি আর সেই প্রভাত নাই? শিক্ষিত-সমাজে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের দীপ্তির মত তোমার যশ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বলে কি আমাকে ভুলে গেলে?

একবার ছোট বোনটীর কথা মনে করে আসিবে। যদিও এক মায়ের গর্ভে আমাদের জন্ম হয় নাই, তথাপি একই মাতার স্নেহসিক্তকোলে আমরা উভয়েই প্রতিপালিত। একবার কি আসিবেনা? তোমার নিকট একটা কথা শুনতে আমার ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ আমার ইচ্ছার মূল্য নাই।

আজই একবার এসো। আমার স্বামী, তোমায় নিয়ে আসিবেন।" ইতি—

তোমার ভগ্নী—"সুরো।"

প্রভাত সুরবালার পত্র পাইল, কিন্তু বর্দ্ধমানে আসিল না। ধীরেন্দ্রবাবুর নিকট আপনার পরিচয় পর্য্যন্তও দিলনা।

এই সময় সুপ্ত বঙ্গদেশে একটা ভৈরব-গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেই ভৈরব-গর্জ্জনে বঙ্গদেশে একটা ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া বিশ্বকে চমকিত করিয়া তুলিয়া ছিল। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের প্লাবনে সজ্ঞাবিহীন দেশখানি উচ্ছ্বাসময়ী নদীর মত নাচিয়া উঠিয়াছিল। দলে দলে বালক, যুবক ও বৃদ্ধগণ স্বদেশী-মন্ত্র প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে ছুটিয়াছিলেন।

এই স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে বর্দ্ধমানে একটী মহা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য "প্রভাতচন্দ্র" আহুত হইলেন।

বিশাল সেই জনসমাগম, সেই গগনভেদী কোলাহল, সেই মহামন্ত্রের উচ্চধ্বনি এবং আনন্দরোল; সেই মহাসভার একটি পার্শ্বে মহিমবাবু জামাতার সহিত বক্তৃতা শুনিবার জন্য উপবিষ্ট। তথা হইতে শুনিতে পাওয়া গেল, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত এইবার বক্তৃতা করিতে উঠিবেন। তিনি অনিমেষনেত্রে

মঞ্চের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার প্রতিপালিত দরিদ্র "প্রভাতচন্দ্র" আজ ভদ্রোচিত বেশে ভূষিত হইয়া মণ্ডপে দাঁড়াইল। প্রভাতচন্দ্র বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাহার উৎসাহময়ী বাণীতে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। বিশাল জনতার মিলিত-করতালি ধ্বনিতে সভাতল মুখরিত হইল। তাহার উত্তেজময়ী বাণীতে ভীষণ কোলাহল যেন সভাতল হইতে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। সেই লক্ষ লোক সমাগত সভামধ্যে কেবল এক বক্তৃতার ভৈরবগর্জ্জন ভিন্ন আর অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। আত্মহারা শ্রোতাগণ মাঝে মাঝে এক একবার কেবল করতালিধ্বনি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতে ছিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া প্রভাতচন্দ্র নিজ আসন পরিগ্রহণ করিলেন।

সভাভঙ্গ হইলে সকলেই চলিয়া গেল। মহিমবাবু জামাতাকে বাড়ী যাইতে বলিয়া প্রভাতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছুদূর গিয়া প্রভাতের দৃষ্টি পশ্চাতে পড়িল। তিনি মহিমবাবুকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িলেন। মহিমবাবু আদর করিয়া তাহাকে কোল দিলেন। সেদিন প্রভাতচন্দ্র আর পরিত্রাণ পাইলেন না। মহিমবাবু তাহাকে ধরিয়া বাড়ীতে আনিলেন।

এদিকে ধীরেন্দ্রবাবু বাড়ীতে আসিয়াই শাশুড়ীঠাকুরাণী ও সুরবালার নিকট প্রভাতের বক্তৃতার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যামিনীঠাকুরণী শুনিয়া কতই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার পালিতপুত্র প্রভাতচন্দ্র আজ বরণীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে আসন পাইয়াছে।

সকলে যখন প্রভাতের সাধনার কথা লইয়া ব্যস্ত এবং সুরবালা প্রভাতের সম্বন্ধে একটা নূতন চিন্তায় নিমগ্না। সেই সময় মহিমবাবু প্রভাতচন্দ্রের হাত ধরিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় মহিমবাবু বাহিরের গৃহে বসিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ এক বন্ধুর বাটীতে দাবা টিপিতে গেলেন। সুরবালাও সময় বুঝিয়া মায়ের সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়া প্রভাতচন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইল। প্রভাত আসিলে, তাহাকে আহার করিতে বসাইয়া তাহার কাছে বসিল।

প্রভাতচন্দ্র ভদ্রলোকের মত একবার "সুরবালা কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিয়াই আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু সুরবালা ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে বলিল,—"দাদা, তুমি কি বিয়ে করবে না?" প্রভাত বিষম বিপদে পড়িল। এইজন্যই বেচারা বর্দ্ধমানে আসিতে চাহে নাই। সুরবালার কথায় কি উত্তর দিবে তাহা সে খুজিয়া পাইল না। সুরবালা আবার জিজ্ঞাসা করিল "দাদা কি বিয়ে করবে না?" প্রভাতচন্দ্র আম্‌তা আন্‌তা করিয়া বলিল, না, তা বল্‌ছি না।"

সুরবালা।—তবে কি বোলছ?

প্রভাত উত্তর করিল না।

সুরবালা বলিল,—প্রভাত দাদা! তোমার বিবাহ না করবার কারণ আমি বুঝিয়াছি। তুমি জগতের কাছে সে কথা লুকিয়ে রাখিলেও সুরবালার নিকট সে কথা লুকাতে পারিবেনা। ভগবানের ইচ্ছা যদি অন্য রকম হইত তাহা হইলে বোধ হয় তুমি সুখী হইতে। কিন্তু আর কি তোমার কোনরূপ সুখী হইবার উপায় নাই?

প্রভাত ভূমিপানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "সুরবালা! আমি চিরকাল অবিবাহিত থাকিব ইহাই আমার ইচ্ছা।" অনেকক্ষণ উভয়ের মধ্যে কেহ কথা কহিল না। শেষে সুরবালা বলিল,—প্রভাত দাদা! ভগবান্ আমায় সংসারে সব সুখ দিয়েছেন। দেবোপম পিতা, স্নেহময়ী জননী, উন্নতচেতা স্বামী, তোমার মত দেশের অলঙ্কারস্বরূপ ভ্রাতা, সবই আমি পেয়েছি, কিন্তু তবু তোমার জন্য আমি মনে একদিনও শান্তি পাই নাই। আমায় বিমর্ষ দেখে অনেক সময় আমার স্বামী কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁকে মিথ্যাকথা বলে চাপা দিয়া রাখি। তুমি কি তোমার ভগ্নিকে একটু শান্তি দেবে না?

প্রভাত কোন কথা কহিল না। সুরবালা উঠিয়া তাহার হাতে ধরিয়া বলিল,—বল তুমি বিবাহ করবে?

প্রভাতচন্দ্র পূর্ব্বের মত নীরব। এমন সময়ে যামিনীঠাকুরাণী একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর হাত ধরিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিলেন। প্রভাতের দৃষ্টি আরোও আনত হইল। যামিনীঠাকুরাণী বলিলেন,—এইটী সুরোর ননদ। এর নাম—"বীণা," এরসঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

যামিনীঠাকুরাণীর কথাও যা, কার্য্যও তাই। তাহার দুইদিন পরে, প্রভাতচন্দ্রের সহিত বীণার বিবাহ হইয়া গেল। এতদিন পরে প্রভাতচন্দ্র সংসারী হইলেন।

বীণাপানি সুন্দরী ও গুণবতী। কিন্তু তাহার মত স্ত্রী পাইয়াও প্রভাত প্রাণে শান্তি পাইল না। বাল্যকাল হইতে তাহার সংসারে আসক্তি ছিলনা। বিবাহ করিয়া সংসারে লিপ্ত হওয়া দূরে থাক, ঘোর বৈরাগ্য আসিয়া তাহার মনকে যেন সংসার

659

হইতে আরো দূরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বিবাহের কিছু-দিন পরে প্রভাতচন্দ্র কলিকাতা যাইবার নাম করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করিল। সে সন্ন্যাসী হইবার আশায় আসিয়াছিল। তথায় গুরু মিলিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। গুরু তাহাকে নব-বিবাহিত জানিয়া গৃহে ফিরিতে আদেশ করিলেন। অগত্যা প্রভাত আবার দেশে ফিরিল। একমাত্র পাঠ ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে তাহার মনের দৃঢ়তা ছিল না।

প্রভাত আইন-পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়াই পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন। তাহার মত ছাত্রকে বিফল মনোরথ হইতে হইল না। সে পরীক্ষাতেও তাঁহার নাম সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে লিখিত হইল। এই সময়ে ফরিদপুরে একটী স্বদেশী সভা হয়। প্রভাতচন্দ্র সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইলেন।

লোকনাথ মিত্র ফরিদপুরের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। সভার কার্য্যাদি শেষ হইবার পর তিনি প্রভাতচন্দ্রের সহিত একটু পরিচয় করিতে আসিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর লোকনাথবাবু প্রভাতকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজভবনে লইয়া গেলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে এমন সময়ে লোকনাথবাবু প্রভাত-চন্দ্রের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমার একটী রোগীর অবস্থা বড় খারাপ, তাই যাইতেছি বোধ হয় রাত্রে আজ আর আসিতে পারিব না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতচন্দ্রের শয্যার উপর একখানি নেপোলিয়াম বোনা-পার্টির জীবনচরিত পড়িয়াছিল। তিনি সেই পুস্তকখানি

লইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে সহসা যুবতীর অলঙ্কার শব্দে তাহার একাগ্রতা ভঙ্গ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন এ কোন-দেশীয় সভ্যতা। নির্জ্জন কক্ষে গভীর রাত্রে অপরিচিত যুবকের সম্মুখে যুবতী রমণীর আগমন কি এই দেশের নীতিসঙ্গত। তাঁহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটী তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল,—আমার মুখপানে চেয়ে আছেন যে?

প্রভাতচন্দ্র লজ্জিত হইলেন এবং দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিলেন।

স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিল,—আপনার খাবার দেওয়া হইয়াছে আসুন।

প্রভাতচন্দ্র জীবনে এমন বিপদে কখন পড়েন নাই। তিনি সামান্য বিষয়ে বিচলিত হইবার যুবক নহেন। যুবতীর কথামত প্রভাতচন্দ্র তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যুবতী তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দুইটী কক্ষের মধ্য দিয়া গিয়া একটী উঠান পার হইবার পর একটী ক্ষুদ্র ফুলবাগানের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। যুবতী অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। প্রভাতচন্দ্র বাগানের মধ্যস্থিত স্থানে আসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠে কতকগুলি ফুল আসিয়া পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে চাহিলেন,—সঙ্গিনী যুবতীও সেই সময়ের মধ্যে অদৃশ্যা হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া শেষে নিকটস্থ একটী মঞ্চে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে সঙ্গিনী যুবতী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং

বলিল,—আসুন আপনার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। প্রভাতচন্দ্রের কথা কহিবার সাহস হইতেছিল না, তিনি মন্ত্রচালিতের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বাগান পার হইয়া তাহারা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। তথায় রমণী কি পুরুষ কেহই ছিলেন না। সঙ্গিনী যুবতী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া আসনে বসিতে বলিল এবং আহার্য্য আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। প্রভাতচন্দ্র আহারে বসিলেন। নানারূপ উপাদেয় খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করিতে পারিলেন না। একটু পরে তাঁহার মনে হইল কে যেন পশ্চাতে ফিচ্ ফিচ্ করিয়া কথা কহিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে চাহিলেন। একটী দরজার পার্শ্বে চার পাঁচটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার ভীতিপূর্ণ-দৃষ্টিতে তাহারা সকলে হাসিয়া উঠিল। প্রভাতচন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং কষ্টে স্বষ্টে আহার্য্যদ্রব্য কিছু কিছু আহার করিলেন।

হস্তধৌত করিবার পরেই সঙ্গিনী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্য একটী কক্ষে প্রবেশ করিল। গৃহ মধ্যে একটী পালঙ্কের উপর শয্যা প্রস্তুত ছিল, তথায় শয়ন করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইলেন। সঙ্গিনী তাঁহাকে দরজা বন্ধ করিতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিল। প্রভাতচন্দ্র শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ দেশের লোক খুব ভদ্র সন্দেহ নাই, তবে একটু অসভ্য।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে একটী বৃদ্ধা আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রভাতচন্দ্রের সম্ভাষণ, অভিবাদন বা নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া শয্যার উপর উপবেষণ করিলেন। তাঁহাকে শয্যার উপর বসিতে দেখিয়া প্রভাতচন্দ্র আসুন, বসুন বলিয়া

শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা, তাঁহার হস্তে ধরিয়া বসাইলেন। পরে তাঁহার নাম কি, কোন্ জেলার মধ্যে কোন্ গ্রামে বাড়ী, বাড়ীতে কে কে আছে, পিতার নাম কি এবং বিদ্যা কতদূর ইত্যাদি পরিচয় লইলেন। পরে বলিলেন,—তোমার বিবাহ হয়েছে?"

প্রভাত।—আজ্ঞে না।

বৃদ্ধা।—তবে আমার একটী নাতনি আছে তাকে বিবাহ কর।

প্রভাত।—আমি বিবাহ কোরব না মনে করেছি।

বৃদ্ধা।—মনে করার কথাটা মনেই থাক, আজ ভাল লগ্ন আছে।

এই কথা বলিবামাত্র উলুধ্বনিসহ দুইটী শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। প্রভাত দেখিয়া বিস্মিত হইল।

প্রভাত শয্যা হইতে নামিয়া বলিল,—আমাকে মাপ করিবেন, আমি বিবাহিত।

বৃদ্ধা।—তাঁহাকে পুনরায় শয্যায় বসাইয়া বলিলেন,—তুমি বিবাহিত!

প্রভাত।—আজ্ঞে হঁ্যা।

বৃদ্ধা।—সে স্ত্রী তোমার কোথায়?

প্রভাত।—দেশে আছে।

বৃদ্ধা।—তাকে তুমিতো ভালবাস না।

প্রভাতচন্দ্র মনে মনে বলিলেন,—বৃদ্ধাটি চতুরা।

বৃদ্ধা।—কথা কহিতেছে না যে?

প্রভাতচন্দ্র হতবম্ব হইলেন। তিনি কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এমন সময় পূর্ব্বোক্তা সঙ্গিনী একটী অবগুণ্ঠিতা রমণীকে লইয়া আসিয়া প্রভাতের পার্শ্বে বসাইল।

বৃদ্ধা বলিল,—এইটী আমার নাত বোয়ের বোন। অনেক জায়গায় পাত্র খুজিয়াছি কিন্তু কোথাও সুবিধা মত পাই নাই। আমাদিগকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার কর।

প্রভাতের সর্ব্বশরীর তখন ঘর্ম্মাক্ত।

বৃদ্ধা আবার বলিলেন,—ইহাকে বিবাহ কর, মন্ত্র আমি পূর্ব্বেই পড়িয়া রাখিয়াছি। এই বলিয়া বৃদ্ধা ও সঙ্গিনী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্রই প্রভাতচন্দ্র শয্যা হইতে নীচে নামিলেন এবং দরজা টানিয়া দেখিলেন, বাহির হইতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি এই সাঁওতালের দেশ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মনে মনে বুদ্ধি আঁটিতেছেন—এমন সময়ে অবগুণ্ঠিতা ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া পূর্ণাঙ্গযুবতীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষখানি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। "অবগুণ্ঠিতা" ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া প্রভাতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রভাত সেই যুবতীকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এইসময় প্রভাতের দৃষ্টি একবার অবগুণ্ঠিতার মুখের দিকে পতিত হইল। প্রভাত যে পূর্ব্ব হইতেই বিস্মিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু "অবগুণ্ঠিতাকে" দেখিয়া তাঁহার আর জাগ্রতাবস্থা বলিয়া বোধ হইল না। তিনি ভাবিলেন এই সমস্ত ঘটনা তিনি বোধ হয় নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছেন।

অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা কহিলেন না, বোধ হয়, তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তিনি একদৃষ্টে "অবগুণ্ঠিতার" পানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

"অবগুণ্ঠিতা" নতমুখী হইয়া রহিল। প্রভাত ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিলেন তাহার হস্তখানি নিজহস্তে লইয়া বলিলেন, "বীণা তুমি—তুমি এখানে কেন ?"

"অবগুণ্ঠিতা" মুখ আরও নত করিল। প্রভাত তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া বলিল, "এস বীণা, আর তোমায় আমি কখনও ত্যাগ করিব না।" এই বলিয়া যুবতীর সেই রক্তপদ্মানিভ কম্পিত-অধর-প্রান্তে একটী গাঢ়চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

এমন সময় নারীকণ্ঠে উলুধ্বনিসহ আবার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সেই শব্দে উভয়েই চমকিত হইল। বীণা স্বামীর ভুজপাশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বাহিরে আসিল। প্রভাতচন্দ্রও শয্যায় উপবেশন করিলেন।

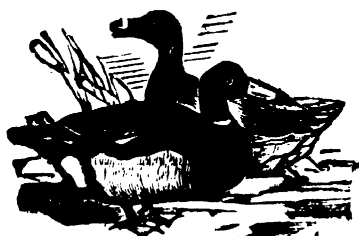
বীণা বাহিরে আসিবার পরই সুহাসিনী ও সুরবালা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভাতকে প্রণাম করিল। তাহাকে দেখিয়া প্রভাতচন্দ্র বুঝিলেন সুরবালা এই সমস্ত কাণ্ড করিয়াছে।

প্রভাত যখন সুরবালার সহিত কথা কহিতে ব্যস্ত সেই সময় পূর্ব্বোক্ত "সঙ্গিনী" আসিয়া প্রভাতচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, একিরূপ সভ্যতা মহাশয় ? ভদ্রলোক বুঝিয়া আপনাকে বাড়ীতে আনিলাম আর আপনি আমাদের কুলবালা কুলবধূর সহিত এইরূপে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনাদের স্বদেশী প্রচারের মধ্যে এইরূপ চরিত্রবান্ বীরপুরুষ কয়টি আছেন ? পরে সুরবালার প্রতি চাহিয়া বলিল,—বৌদিদি ! তোমার একি আক্কেল ভাই, অপরিচিত পুরুষের সহিত একাকী—দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছ।

বেচারী প্রভাতচন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিল না। যাহা

হউক এই সময়ে সেই বৃদ্ধা আসিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। গোলমাল মিটিবার পর আবার অবগুণ্ঠীতা বীণা আসিয়া প্রভাতচন্দ্রের শয্যার অর্দ্ধাংশ অধিকার করিল। প্রভাতচন্দ্র তাহার মুখে শুনিলেন, সুরসিকাসঙ্গিনী তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, লোকনাথবাবু তাহার ভগ্নীপতি এবং বৃদ্ধা লোকনাথবাবুর পিতামহী।

প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেই রাত্রে জাগিয়া জাগিয়া অনেক স্বপ্নই দেখিলেন।





আগন্তুক।

"রক্ষা কর, রক্ষা কর, স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয় রক্ষা কর।"

"কে রক্ষা করিবে?—এই নির্জ্জন বনমধ্যে,—এই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে কে তোমায় রক্ষা করিতে আসিবে?"

গভীর অরণ্য। সূচীভেদ্য অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি। বিশ্বত্রাসি ঝটিকা প্রবাহিতা। সম্মুখে উন্মাদিনী কল্লোলিনী। দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী। ঘটনাস্থলে এক ত্রস্তা যুবতী প্রাণপণে চীৎকারনিরত, আর তাহার বামহস্তে ধরিয়া এক যুবক তাহারই মুখপানে চাহিয়া স্থির। যুবকের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে বোধ হয় সে অন্ধকারের মধ্য দিয়াও যুবতীর মুখের উপর পড়িতেছে। আর যুবতীর চীৎকার এত উচ্চ যে সেই ভীষণ ঝটিকার হুহু শব্দকেও পরাজিত করিয়া দূরে ছুটিতেছে। পার্শ্বে একখানি ভগ্ন-পাল্কী পড়িয়াছিল, এবং তাহার পার্শ্বে কয়েকজন অর্দ্ধমৃত বাহক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। যুবতী উচ্চস্বরে চীৎকার করিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর, স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হয় রক্ষা কর।" যুবক বলিল,—কে রক্ষা করিবে? এই নির্জ্জন বন মধ্যে, এই দুর্য্যোগময়ী রজনীতে কে তোমায় রক্ষা করিতে আসিবে সরলা?"

"সতীর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রের অভাব হয় না। পিশাচ!—সাবধান।" সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। বিদ্যুতা-লোকে যুবক দেখিল, সম্মুখে জটাজুট সমন্বিত রুদ্ররূপী এক

সন্ন্যাসী, তাহাকে সংহার করিবার জন্যই যেন অতর্কিতভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া ত্রিশূল উন্নত করিয়াছেন। বোধ হইল যেন স্বয়ং মহাদেবই সতীধর্ম্ম রক্ষা মানসে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

আগন্তুককে দেখিবামাত্র যুবকের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া রমণীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সে তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল, ক্ষণপ্রভার উজ্জ্বলালোকে অন্ধকার কানন ক্ষণেকের জন্য ঝলসিত হইয়া উঠিল। যুবতী আবার সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। সে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—আমায় রক্ষা করুন।

আগন্তুক স্নেহসূচক স্বরে বলিলেন,—তাই আসিয়াছি। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি ঐই পাল্কীর মধ্যে উঠিয়া বসুন, আমি উহা মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি। আপনার শ্বশুরমহাশয়ের সহিত আমার আলাপ আছে, তাঁহার নাম কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁহার বাড়ী জানি তাঁহার নিকটেই লইয়া যাইব। আগন্তুকের সহিত শ্বশুরের আলাপ আছে শুনিয়া যুবতী আশ্বস্ত হইল, সে সন্ন্যাসীর কথামত পাল্কীতে উঠিয়া বসিল। অপূর্ব্ব কৌশলে পাল্কীটি মাথায় লইয়া সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া সন্ন্যাসী চলিলেন।

সুবর্ণগ্রামের জমিদার কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অতিশয় রুক্ষ মেজাতের লোক ছিলেন। সংসারে একমাত্র পুত্র—দেবীপ্রসাদ, পুত্রবধূ—সরলা, বিধবা ভাগিনেয়ী কামিনী ও একটী বিধবা ভগ্নী (কামিনীর জননী) ভিন্ন অপর কেহ ছিল না। কামিনীর আর

একটী ভগ্নী ছিল, তাহার নাম যামিনী। যামিনী ও তাহার স্বামী গোপীনাথ, মাঝে মাঝে সুবর্ণগ্রামে আসিয়া ২।১ মাস করিয়া থাকিত।

বিধবা ষোড়শী-যুবতী কামিনীর উপর নষ্ট-চরিত্র গোপীনাথের কুদৃষ্টি পড়িল। হতভাগিনী জানিল না যে পাপাত্মা গোপনে তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের পন্থা অনুসন্ধান করিতেছে। সে বালিকা-বয়সেই বিধবা হইয়াছিল বলিয়া মাতার নিকট অতিরিক্ত আদর পাইত। মাতারই কথায় বিধবা যুবতী ভগ্নীপতিকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে যাইত। গুণধর ভগ্নীপতি সুযোগ বুঝিয়া হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ করিল। পাপকর্ম্ম অধিকদিন লুকান থাকে না। ২।৫ দিন পরেই এই ঘটনা দেবীপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভগ্নীপতির গলাধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

স্ত্রীলোক যতদিন পবিত্র থাকে, ততদিন সে স্নেহময়ী, লজ্জাশীলা; সামান্য কারণেই ত্রাসিতা কুরঙ্গিণীর মত চঞ্চলা। কিন্তু যেদিন পবিত্র রেখার অতিক্রম করিল, সেইদিন হইতে সে হৃদয়হীনা পিশাচী। সেইদিন হইতে দয়া, মায়া, স্নেহ, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি স্ত্রীলোকের ভূষণগুলি তাহার নিকট হইতে চিরদিনের জন্য একে একে বিদায় গ্রহণ করে। সেইদিন হইতে সে কাল ভুজঙ্গিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। নষ্টচরিত্রা কামিনী তাহার প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। মনে মনে কার্য্যসিদ্ধির যুক্তি করিতে লাগিল।

একদিন রাত্রে সকলেই যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় সে একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। কমলাকান্ত তাহার সহসা চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসী অম্লান বদনে

বলিল,—"দাদা আমার গৃহে আসিয়া আমার নিদ্রিতাবস্থায় অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল।"

সেই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতাকর্ত্তৃক নিরপরাধ পুত্র নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন সরলা তথায় ছিল না। দেবীপ্রসাদ সেই রাত্রেই পিতৃগৃহ হইতে সরলার সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

সরলার পিত্রালয় নিকটবর্ত্তী গ্রামে। সেই রাত্রেই তিনি তাহাকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন! সরলা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা-মাত্র, তখন তত বুঝিবার শক্তি ছিল না। সে বলিল,—বোধ হয় তুমি কামিনী ঠাকুর্ঝির ঘরে গিয়েছিলে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন,—আমি সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য তোমার নিকট আসি নাই সরলা! পিতার আজ্ঞায় আমি গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তোমার নিকুট বিদায় লইতে আসিয়াছি।

সরলা বালিকা; সে দেবীপ্রসাদের মনের ভৈরবী ছায়া দেখিতে পায় নাই তাই কথা কহিল না।

দেবীপ্রসাদ আবার বলিলেন,—তবে চলিলাম, যদি বাঁচি দেখা হইবে।—"নইলে এই শেষ।"

কি ভাবিয়া সরলা তথা হইতে চলিয়া গেলেন্। দেবীপ্রসাদও দাঁড়াইলেন না। একটু পরেই সরলা তাহার ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু দেবীপ্রসাদকে দেখিতে পাইলনা। ঠিক এই সময়ে বাহিরে তাহাদেরই অট্টালিকাপার্শ্বে পূর্ণ সলিলা নদীবক্ষে ঝপাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। উভয়েই চাহিয়া দেখিল, দেবীপ্রসাদ জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল। লোকজন ছুটিল, কিন্তু দেবীপ্রসাদকে খুঁজিয়া পাইল না। সকলেই বুঝিল, সে ঘূর্ণিতে ডুবিয়া গিয়াছে।

দেবীপ্রসাদের মৃত্যু সংবাদ কমলাকান্তের নিকট পৌছিল। পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তাঁহার কর্ত্তব্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই করুণ ক্রন্দনপূর্ণ জমীদার-ভবনে কেবলমাত্র একজন হাসিল। সে—"পিশাচী কামিনী।"

এতদিন পরে গোপীনাথ আবার আসিল। পিশাচ পিশাচী আবার পাপবাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিল।

কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সরলার উপর গোপীনাথের দৃষ্টি পড়িল। সে বুঝিল, কামিনী এ বাড়ীতে থাকিলে এই নূতন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই স্বাধীনভাবে গৃহস্থালী করিবার ভাণ করিয়া সে কামিনীকে গৃহ হইতে লইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে লুকাইয়া রাখিল, কামিনী তথায় রহিল। কিন্তু গোপীনাথ পূর্ব্ববৎ শ্বশুরবাড়ী আসিতে লাগিল। পরে গোপীনাথ,—একদিন সরলা পিত্রালয় যাইবে শুনিয়া আট জন লাঠিয়াল সঙ্গে গন্তব্য পথের জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল।

তাহার পরের ঘটনা পাঠক জানেন।

এখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং অন্ধকার, আকাশতল ক্ষণিকের তরে উদ্ভাসিত করিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। বাহিরের গৃহে একখানি চেয়ারে বসিয়া বৃদ্ধ কমলাকান্ত কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে জল পড়িতেছিল মাঝে মাঝে সেই জল মুছিয়া তিনি আবার সেই অন্ধকার পানে চাহিতেছিলেন। কিন্তু এ অন্ধকারে বৃদ্ধের ক্ষীণদৃষ্টি কি দেখিবে। এ অন্ধকার মনুষ্যের অদৃষ্টের মত নিবিড়। এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাঁহার সম্মুখস্থ আলোকের সম্মুখে সেই সন্ন্যাসী একখানি পাল্কী মাথায় করিয়া আসিয়া

দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের পার্শ্বে একটি ভৃত্য বসিয়াছিল, সে পাল্কী-বাহককে দেখিবামাত্র সভয়ে রাম, রাম শব্দ করিতে করিতে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল, বৃদ্ধও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একি মানুষ না অসুর। একাকী একটা পাল্কী মাথায় করিয়া আনিল। পাঠক, বোধ হয় বিস্মিত হইবেন, কিন্তু এখনও বাঙ্গালাদেশে এমন শক্তিশালী পুরুষ দুই একজন আছেন, যাঁহারা ভূমি হইতে আরোহীসহ একখানি পাল্কীকে অনায়াসে তুলিয়া লইতে পারেন।

আগন্তুক বলিলেন,—এই আপনার পুত্রবধূ আপনার জামাতা কর্ত্তৃক পথে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ইঁহাকে গ্রহণ করুন।

বৃদ্ধ সহসা সেই সন্ন্যাসীবাহিত পাল্কী মধ্যে পুত্রবধূকে দেখিয়া এবং সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আগন্তুক আর কোন কথা কহিলেন না। বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তিনি স্ফটিক-স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা মেঘগর্জ্জনে তাহার সেই ঐকান্তিকতা দূর হইল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না। সেই নিবিড় অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

কামিনী বাল-বিধবা। জননী ঔদাসীন্যে তাহার চরিত্র অন্য ভাবে গঠিত হইয়াছিল। ভগ্নীপতির সহিত বিংশবর্ষীবয়সে স্নেহময়ী জননীর সাধের সংসার ত্যাগ করিয়া সোণারপুর গ্রামে গোপনে বাস করিতে লাগিল। প্রথম কিছুদিন গোপীনাথ প্রায়ই তাহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন; পরে যে জন্য কামিনীকে অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যের জন্য অন্যত্র ব্যস্ত হইলেন— যেদিন রাত্রে তিনি ঝটিকা ও ঝঞ্ঝায় গভীর বনমধ্যে সরলাকে

আক্রমণ করেন, ঠিক সেইদিন তেমনি সময়ে আবদুললতিফ নামে এক মুসলমান্ তিনজন অনুচরসহ কামিনীর গৃহে প্রবেশ করিল। কামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। সে যাহাই হউক কলঙ্কিনী হউক আর কুলের বহিষ্কৃতা হউক হিন্দু ছিল। সেই রাত্রে মুসলমান কর্ত্তৃক তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হইল। অলঙ্কারপত্র এবং নগদ অর্থাদি যাহা ছিল সমস্তই অপহৃত হইল। হতভাগিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল,—সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

তাও সে কি জানিত যে তাহার এত দুর্দ্দশা হইবে, সে কি জানিত ইন্দ্রিয় সুখের পরিণাম এত ভীষণ, সে কি জানিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ানক। যদি জানিত তাহা হইলে কি এ পথে পদার্পণ করিত? এই কি পাপের পরিণাম? না কুলত্যাগিনীর পরিণাম আরও ভীষণ?

কামিনী স্বভাবতঃ সুন্দরী ছিল। কিছুদিনের জন্য সে আর এক যুবকের অঙ্কশায়িনী হইল। কিন্তু এবার ইচ্ছায় নয়, ক্ষুধার তাড়নায় নূতন নায়কের সহিত কলিকাতায় আসিল। কিছুদিন উভয়ে একত্র থাকিয়া নায়কের পিপাসা মিটিলে সে আবার পরিত্যক্ত হইল। তাহার পর জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল।

তৎফলে কতকগুলি কুৎসিৎ রোগ তাহার দেহে প্রবেশ করিল। রূপও গেল, সৌন্দর্য্যও গেল, যৌবনও যায় যায় হইয়া উঠিল।

এইবার পিশাচী কি করিবে? যেদিন গভীর রাত্রে স্নেহময়ী জননীকে ফাঁকি দিয়া ইন্দ্রিয়ের পিপাসা মিটাইবার জন্য চলিয়া আসিয়াছিল, সেদিন একবারও ভাবিয়াছিল কি? সেই পাপের এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত? সেদিন জানিতে কি যে কঠোর জ্বালায় অস্থির হইয়া সমস্ত রাত্রি তোমায় পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

আজ তুমি দাঁড়াইয়াছ,—তোমার পরিধানে নীলাম্বরী শাটী, তোমার কবরীতে সদ্য প্রস্ফুটিত চম্পকপুষ্প। পুষ্পবিনিন্দিত হস্তে পুষ্পের তোড়া, তাম্বুল-রাগরঞ্জিত অধরপ্রান্তে হাসি—নয়নে বিলাস-ভঙ্গিমাযুক্ত অপাঙ্গ-দৃষ্টি, বোধ হয় ভাবিতেছ তোমাকে ভাল সাজিয়াছে। কিন্তু কামিনী তোমার ঐ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে অন্তরের গাঢ় কালিমা কি দেখা যায় না। ঐ হাসির মধ্যে তোমার জঠরের জ্বালা কি লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছ? তুমি পিশাচী, এখনও কুলত্যাগের উপযুক্ত শাস্তি তোমার হয় নাই। আরও কঠোরতর দণ্ড তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

সরলালাভে বঞ্চিত হইয়া হতাশ প্রেমিক গোপীনাথ বাড়ী ফিরিলেন। গোপনে সরলার সন্ধান লইয়া তাহাকে পাইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কামিনীর কথা বোধ হয় তখন আর তাহার মনে ছিল না, মনে থাকিলেও তাহাকে দেখিতে যাইবার সময় ছিল না, কিম্বা সময় থাকিলেও বুঝি ইচ্ছা হইত না।

অনেকদিন যাইল, কিন্তু স্মৃতি—পাপীর মন হইতে মুছিলনা। সে আবার সরলাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এবার আয়োজন কিছু গুরুতর। প্রায় একশতজন লাঠিয়ালসহ গোপীনাথ অমাবস্যার রাত্রে কমলাকান্তের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। আজ অমাবস্যা। সন্ধ্যার সময় কমলাকান্ত একটু জলযোগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাড়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, কমলাকান্ত শশব্যস্তে বলিলেন,—"ঠাকুর কি কর কি কর, তুমি আমায় প্রণাম করিতেছ কেন?"

সন্ন্যাসী।—আপনি পিতৃতুল্য, তাই প্রণাম করিতেছি। বিশেষতঃ আপনি ব্রাহ্মণ আপনার প্রণাম গ্রহণের অধিকার আছে।

"আপনি আমার পিতৃতুল্য"—এই কথাটি শুনিয়া কমলাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুষ্ক কপোলে দুইবিন্দু অশ্রু ঝরিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—বাবা আপনি কাঁদছেন কেন? বৃদ্ধ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বল বল, আবার বল, অনেকদিন কেউ আমায় এমন ভক্তিপূর্ণস্বরে বাবা বলে নাই। বল, সন্ন্যাসী আবার বল। সন্ন্যাসী একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তিনি বলিলেন,— "আপনার পুত্র বুঝি মারা গিয়াছে।"

বৃদ্ধ।—না, না মিথ্যা কথা, কে বলিল মারা গিয়াছে? সে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছে। বলনা সন্ন্যাসী, তুমি কি আমার পুত্রের সংবাদ জান?

সন্ন্যাসী।—না, আমার সঙ্গে তো তাঁর আলাপ নাই। বৃদ্ধ হতাশ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না আপনার মত বৃদ্ধ পিতাকে কাঁদাইয়া আপনার পুত্র তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন, সে তীর্থ ভ্রমণে কি পুণ্য সঞ্চয় হইবে? তবে কি তিনি কোনরূপ অনুরাগে গৃহত্যাগ করিয়াছেন!

বৃদ্ধের কোঠর-গত চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন,—কি ব'লচ?

সন্ন্যাসী।—তিনিও যুবক, তাই বলিতেছি কোন কামিনীর প্রতি আসক্তই কি তাহার গৃহ ত্যাগের কারণ? বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ পদসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"আমার

পুত্র সাধু। পরনারীকে জননীর মত দেখিত, আমি মোহে পিশাচীর কুহক না বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বিনা অপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম”। এই বলিয়া বৃদ্ধ হো—হো শব্দে কাঁদিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী।—যখন আপনি নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন তখন, তাঁহার দোষ ছিল নিশ্চয়ই। আপনি অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সে দোষ ভুলিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—আমার পুত্রের চরিত্রে কালিমা। সন্ন্যাসীঠাকুর আমি এতদিন ভ্রমান্ধ হইয়াছিলাম কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম কাটিয়াছে। আমি নিদাঘ-তপ্ত দ্বিপ্রহরে শৈত্য অনুভব করিতে পারি কিন্তু আমার পুত্রের চরিত্রে আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সন্ন্যাসী একবার দাঁড়াইলেন। একবার এদিক ওদিক ফিরিলেন। পরে বৃদ্ধকে বলিলেন,—আজ আপনার গৃহে রাত্রে একটু আশ্রয় পাইব কি?

বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত বলিলেন,—আমার সৌভাগ্য। আগন্তুক সেই রাত্রে কমলাকান্তের অতিথি হইলেন।

অতিথিকে ভোজন করাইয়া কমলাকান্ত অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আগন্তুক বাহিরে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া একটী তুলসীমঞ্চের নিম্নে উপবেশন পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এমন সময়ে একটা শব্দে তাঁহার ধ্যান ভগ্ন হইল। চমকিত হইয়া উঠিয়া দেখিলেন, প্রায় কুড়ি জন দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লাঠি হস্তে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আর দেখিলেন, তাহাদের অগ্রে নরপিশাচ গোপীনাথ। পিশাচের মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার করে আপনা আপনি ত্রিশূল

উঠিল। তিনি যেন কোন দৈবশক্তির বলে চালিত হইয়া গোপীনাথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

গোপীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কে? ইহাকে যে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সেই রাত্রে সেই গভীর বন মধ্যে সরলার ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য এই সন্ন্যাসীইতো তাহার পৈশাচিক দৃষ্টির সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল।

গোপীনাথের মুখে কথা বাহির হইল না। হাত নড়িল না, পদদ্বয় নিশ্চল হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া দশ বার জন লোক চীৎকার করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সন্ন্যাসীও ত্রিশূল ধরিলেন, বিলম্বিত জটাকলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বিদ্যুতের মত তাঁহার করে ত্রিশূল ঘুরিতে লাগিল। একে একে ৫।৭ জন লোক গতাসু হইল। তাহাদের চীৎকারে কমলাকান্ত ও পরিবারবর্গ সকলে জাগ্রত হইয়া ছাদে উঠিলেন, সকলেই স্তম্ভিত। চারিদিকে পিপীলিকার মত অস্ত্রধারী মনুষ্য, আর তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র সন্ন্যাসী। তাঁহারা সকলে সন্ন্যাসীর সাহায্যের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন।

লাঠিয়ালগণ পয়সার লোভে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিতে আসে নাই। পনের ষোলজন ভূতলশায়ী হইবার পরে আর কেহই তথায় দাঁড়াইল না, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পারিল না কেবল হতভাগ্য গোপীনাথ।

লাঠিয়ালগণ পলাইল দেখিয়া, সন্ন্যাসী গোপীনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিয়া

বলিলেন,—পিশাচ, আজিও তোমার পাপ ইচ্ছা নষ্ট হয় নাই, তাই আবার এখানে আসিয়াছ ?

গোপীনাথের হস্ত তখন অবশ হইয়াছিল, ভয়ে মুখে কথা বাহির হইল না।

লোকজন পলাইয়াছে দেখিয়া কমলাকান্তের দরোয়ান, ভৃত্য এবং অন্যান্য সকলে তথায় আসিয়া জুটিল। কমলাকান্ত আসিলেন, কুলাঙ্গনাগণও দূরে দাঁড়াইল। যামিনী দেখিল, তাহার স্বামীর মৃত্যু নিকট। সে স্বামীর নিকট কখনও তিলমাত্র আদর পায় নাই। সধবা হইয়াও চিরদিন স্বামী সুখে বঞ্চিতা, তথাপি সে হিন্দু-ললনা,—সে পতিব্রতা। তাই স্বামীর বিপদে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সব ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ধরিয়া স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল।

যামিনীর কাতরতায় সন্ন্যাসী বলিলেন,—যাও পিশাচ, সতীর কথায় আজও তোমায় ক্ষমা করিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।

এমন সময়ে উন্মাদিনী তরঙ্গিনীর মত গর্জ্জন করিতে করিতে স্খলিতকেশা, অৰ্দ্ধনগ্নবেশা এক পাগলিনী হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উন্মাদিনী বলিল,—কি গোপীনাথ চেয়ে আছ যে, আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? তা আর পারিবে কেন ? আমি পিশাচী, আমি রাক্ষসী, আমি কামিনী।

সকলেই নিস্তব্ধ। কমলাকান্ত তাহার মুখপানে চাহিয়া অবাক্। গোপীনাথ তাহার পানে চাহিয়া নির্ব্বাক্। এমন কি সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সহসা তাহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত। অমানিশার ভীষণ অন্ধকারে তাহার মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া

যাইতেছিল না, কিন্তু অগ্নিময় গোলকের মত তাহার চক্ষুদ্বয় সেই অন্ধকারে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। উন্মাদিনী সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া বলিল,—এই যে দাদা এসেছ! পিশাচীকে ক্ষমা কর। পরে কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল,—মামা! দাদাকে চিনতে পারছেন না? আমি মরিব বলিয়া আমার চক্ষুর জ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইয়াছে। আপনার সম্মুখে সন্ন্যাসী বেশে দাদা দাঁড়াইয়া আছেন।

উন্মাদিনী পুনরায় গোপীনাথের প্রতি চাহিয়া বলিল,—পিশাচ! তুমি আমায় অনেক যন্ত্রণা দিয়াছ। অনেক সময় অশান্তিতে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও আমার কষ্টের অবসান হয় নাই বলিয়া, আমি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। জঘন্য রোগাক্রান্ত হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় একমুষ্টি উদরান্নের জন্য পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। কেহ আমায় ভিক্ষা দেয় নাই, লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। পদাহতা ভুজঙ্গিনীর মত তৎক্ষণাৎ তোমার গৃহ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। উদ্দেশ্য তোমার রক্তে জঠর জ্বালার শান্তি করিব। তোমার বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম, সরলার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ। অমনি বিদ্যুতের মত তেজে, বাতাসের মত দ্রুতবেগে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। উঃ! বড় জ্বালা। এই বলিয়া উন্মাদিনী কটিদেশ হইতে এক ভীষণ ছুরিকা বাহির করিল। নিমেষের মধ্যে তাহার হস্ত উপরে উঠিল এবং উল্কাবেগে গোপীনাথের বুকে সেই ছুরিকা বসাইয়া দিয়া তাহার জীবনের লীলাখেলা সব শেষ করিয়া দিল। কামিনী সেই রক্তাক্ত ছুরিকা গোপীনাথের বুক হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল।

আবার সেই ছুরিকা ঊর্দ্ধে উঠিল। নক্ষত্রবেগে কামিনীর বুকে বসিল; কামিনী পড়িয়া গেল।

এই ঘটনা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অতর্কিত ভাবে হইল যে কাহারও মুখ হইতে একটি কথা কহিবার সময় ছিলনা বা কেহ এক পা অগ্রসর হইতে পারিল না।

কামিনীর বৃদ্ধা জননী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কামিনী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—মা, চলিলাম।

সন্ন্যাসী একটু জল তাহার মুখে দিতে গেলেন, কিন্তু সে খাইল না। কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে জোড়হস্তে জড়িতস্বরে বলিল,—দাদা, আমায় ক্ষমা কর। বৌদিদি, আমায় ক্ষমা। যামিনী—অভাগিনী—ওঃ—মা—। আর কথা বাহির হইল না। কেবল শতধারে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কমলাকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন। সকলেই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আগন্তুক দেবীপ্রসাদের চক্ষেও জল-বিন্দু দেখা দিয়াছিল।

যামিনী পূর্ব্ব হইতেই মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। তাহার আর সংজ্ঞা হইল না। তাহারও জীবন শেষ হইল।

সেই ভীষণ দুর্ঘটনার মধ্যে বৃদ্ধ কমলাকান্ত আবার পুত্র ফিরিয়া পাইলেন। বিধবাবেশধারিণী সরলা আবার সধবা হইল।





প্রায়শ্চিত্ত।

১

চপলার বয়স এখন তের বৎসর। বাঙ্গালীর বাড়ীতে মেয়ে আর অবিবাহিতা রাখা চলে না। তাই তাহার পিতা হরেন্দ্র নারায়ণ বসু পাত্র সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ঘটককে ডাকিয়া বলিলেন,—পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত নগদ দিব। উচ্চ বংশ চাই, কুলীন চাই, পাশকরা জামাই চাই, জামায়ের পিতার বিষয় থাকা চাই। অনেক সন্ধানের পর ঘটক ঠিক সেইরূপ একটী "পাত্র" খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কন্যা-কর্ত্তা সেই পাত্রে কন্যা দান সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু কন্যার মাতা তাহাতে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—সৎ-বংশীয় একটী দরিদ্র পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতাকে গৃহে রাখিবেন। বড় লোকের বাড়ীতে মেয়ে দিলে মেয়ের সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকে না।

গৃহিনীর ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত ত্রয়োদশবর্ষীয়া চপলার বিবাহ হইল। সত্যেন্দ্র এখন দ্বাবিংশ বয়স্ক যুবক। উচ্চবংশে তাহার জন্ম। তাহার পিতামহ নাকি

কোন রাজবাড়ীর দেওয়ান ছিলেন। বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব, অতিথি সেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু কাল-চক্রে সেই সংসার এখন অন্ধকারময় হইয়াছে। বাল্যকালে সত্যেন্দ্রও দাস-দাসীর কোলে পালিত হইয়াছিল। তাহার পিতা তাহার অঙ্গে এক সময় হাজার টাকার অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে এখন সে পরের আশ্রিত। পরের আশ্রয়ে থাকিয়া অধ্যবসায়শীল সত্যেন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার পর সন্ধানী ঘটক মহাশয়ের কৃপায় চপলার সহিত তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর হরেন্দ্রবাবু তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা পাঠাইলেন। সত্যেন্দ্র কলিকাতায় পড়িতে লাগিল, এবং তাহার মধ্যেই অবকাশমত শ্বশুর গৃহে আসিয়া নব-পরিণীতাকে "মনের মত" করিয়া লইবার চেষ্টা করিত।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। চপলা তাহার পিতার একমাত্র সন্তান। তাই সে বড় আদরের মেয়ে ছিল। ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সে এক এক দিন তাহার পিতার বসিবার বাহিরের ঘরে আসিয়া আব্দার করিত। জমীদারের এক কন্যা বলিয়া চপলা সব বিষয়েই একটু একটু স্বাধীনতা পাইয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে একটী হারমোনিয়ম দিয়াছিলেন, সে তাহা বাজাইয়া গান করিত। আলমারি আলমারি পুস্তক কিনিয়া দিয়াছিলেন, চপলা তাহা পড়িত। ইহা ছাড়া উলের ফুল তোলা, লেস্ প্রস্তুত করাও তাহার জানা ছিল। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সে কখনো দেখিত না। আর দেখিবার প্রয়োজনও হইত না বলিয়া পিতামাতাও দেখিতে দিতেন না। পাঠিকা, হয়তো

বলিতে পারেন, কেন ইহাতে নিন্দা করিবার কি আছে? আপনারা বলিতে পারেন, লেস্ তো আমরাও তৈয়ারী করি। নভেল তো আমরাও পড়ি। হারমোনিয়ম তো আমরাও বাজাই। তায় দোষ কি?

ক্ষমা করিবেন, আপনাদিগকে নিন্দা করা আমার ইচ্ছা নয়। ইহাও জানা আছে আপনাদের নিন্দা করিলে আমার মহা পাপ হইবে। কিন্তু চপলার দেহে উক্ত তিনটী ব্যতীত আরও একটি অতিরিক্ত রোগ ছিল।—"সেটি অহঙ্কার।" সে তাহার বরের (চতুর্দ্দশবর্ষীয়ার পতিকে স্বামী বলিলে ব্যাকরণ দুষ্টতা হইয়া পড়ে তাই বর বলিলাম) নিকট প্রায়ই পিতার সম্পত্তির বড়াই করিত। এবং সেই সঙ্গে তাহার দারিদ্র্যের কথা তুলিয়া উপহাস করিতেও লজ্জা বোধ করিত না। চপলার জননী একদিন এই কথা জানিতে পারিয়া চপলাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহাতে হরেন্দ্রবাবু গৃহিনীকে বলিয়াছিলেন,— এখন চপলা ছেলে মানুষ ওর কি বুদ্ধি আছে? তোমার আপনার কথা মনে করনা; বয়েস হ'লেই সব সেরে যাবে।

পিতামাতার আদরের কোলে পালিত হইতে হইতে চপলা পঞ্চদশ বৎসরে উপনীত হইল।

২

চপলা এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া। বসন্ত-প্রভাতে কুসুমিত-কুঞ্জ-বনের মত শোভাময়ী নবীনা যুবতী। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যা বেলা সে আপনার কক্ষে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

এমন সময় কনকলতা আসিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আমি কে বল দেখি?

চপলা চক্ষু হইতে কনকের করদ্বয় ছাড়াইয়া বলিল,—মরণ আর কি! এত রঙ্গ কেন?

কনক।—আমি মনে করেছিলাম তুই চিন্তে পার্ব্বি না।

চপলা বলিল,—তারপর এমন সময়ে তোর বড় যে অবসর হ'ল?

কনক।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে এলাম। সত্যেনবাবু আজ এত বিমর্ষ—মুখ নামিয়ে রয়েছেন কেন? দেখে মনে হয় যে কি দুঃখ হয়েছে। তুই কিছু বলেছিস্ না কি? এত বড় হলি তবু তো তোর বুদ্ধি হ'লো না।

চপলা।—আমি আবার কি বলবো। পরীক্ষাতে ফেল হয়েছে খবর এসেছে, তাই এমন করে বেড়াচ্ছে।

কনক।—(আশ্চর্য্য হইয়া) সত্যেনবাবু ফেল হয়েছে? তোর মিছে কথা।

চপলা।—কেন, ওকে কি আর ফেল হ'তে নাই? সম্বৎসর ইয়ারকি দিয়ে বেড়িয়েছে তো তার ফেল হবে না তো কি?

এমন সময় গৃহিণী আ[illegible]তাহাদের বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিলেন। গৃহিণী একটু হাসিতে হাসিতে কনকলতাকে সম্ভাষণ করিয়া তাহার পর চপলাকে বলিলেন,—আমার বড় মাথা ধরেছে তুই একবার সত্যেনের খাওয়ার কাছে বস্‌গে। একে আজকে তার মন খারাপ।

চপলা মুখ নামিয়ে বলিল,—আমি পার্ব্বোনা,—তুমি যাও।

গৃহিণী কন্যাকে অনেকবার বলিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হইল না দেখিয়া চলিয়া গেলেন। দুই একটা কথাবার্ত্তার পর কনকও প্রস্থান করিল। চপলা হারমোনিয়ম লইয়া বসিল।

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন।

পৃথিবী স্থির যেন একটা মহাপ্রলয়ের অপেক্ষা করিতেছে। বাতাসে একটী পাতাও কাঁপিতেছে না। একটী সামান্য শব্দও পৃথিবীর সেই গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে সাহসী নয়।

এই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে চপলা হারমোনিয়মের স্বরে গলা মিশাইয়া গান ধরিল,—

"আমার কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥"

উঠিয়া নামিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চপলার কণ্ঠস্বর ছুটিল। সেই কণ্ঠস্বরে নিস্পন্দ পবন জাগিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই স্বরলহরীকে তুলিয়া তুলিয়া নামাইয়া নামাইয়া বহিতে লাগিল। হারমোনিয়মের উপর চপলার নবপ্রস্ফুটিত চম্পক-পুষ্পেরমত অঙ্গুলিগুলি নাচিতে লাগিল। চপলা কণ্ঠস্বর আরও একটু উচ্চে তুলিয়া গাহিল ;—

"আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক ফুল,
আমারি আনিতা নদী উথলিয়া উঠে কূল,
ছুটেছে আকুল মোহ হৃদয়ের তুলনায়।
আমার তরণী লয়ে চলেছে অকূলে ব'য়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে ভাসায়েছি আপনায়,
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমারি পায়॥"

এই সময় বিষণ্ণমুখে সত্যেন্দ্রনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সত্যেন্দ্র ভাবিয়াছিল আজ সে নিশ্চয় চপলার নিকট সহানুভূতি পাইবে। চপলা বালিকা তাই সে এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না আজ এই মনোকষ্টের দিনে চপলা তাহাকে সান্ত্বনা দিবে। তাই সে চপলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখপানে চাহিল।

সত্যেন্দ্র আশ্চর্য্য হইল সে মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্রও নাই সহানুভূতির—রেখা পর্য্যন্তও সে মুখে প্রকাশ পায় নাই। সে বুঝিল চপলা তাহার দুঃখের অংশ গ্রহণ করে নাই। তাহার বড় দুঃখ হইল। সে একদৃষ্টে চপলার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

চপলার গান এখনও থামে নাই সে গাহিতে ছিল।—

আমার কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥"

গান থামিল। হারমোনিয়মের সুর ধীরে ধীরে বাতাসে বিলীন হইয়া গেল। চপলা উঠিয়া একটা পান মুখে দিয়া শয়ন করিল।

সত্যেন্দ্র চপলার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিল—'চপলা।'

চপলা বিরক্তিসূচক স্বরে বলিল,—"আঃ! আমার ঘুম পেয়েছে।"

সত্যেন্দ্র এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না; সে বলিল ঘুমতো তোমার রোজই পায় আর ঘুমের অভাবো তো বড় দেখিনা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

চপলা বলিল—'কি!'

এই একটী মাত্র ক্ষুদ্র কথা শুনিয়া সত্যেন্দ্রের বুকে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য সে সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ফেল হয়েছি ব'লে তুমি কি দুঃখিত হয়েছ?"

চপলা,—কথা কহিল না।

সত্যেন্দ্র,—বলিল "পাশ ফেল তো আর আমার নিজের হাত নয়। যা কপালে ছিল হয়েছে।"

চপলা একটু 'মহাজনী' স্বরে উত্তর করিল "পাশ ফেল আমার

কপাল কি ? পড়লে পাশ হ'তে, ভাল করিয়া পড় নাই—তাই ফেল হইয়াছ।''

ক্ষত স্থানে সামান্য আঘাত লাগিলে অস্থির হইতে হয়। কথাটা সত্যেন্দ্রর বুকে বড় বাজিল। তবু সে বলিল ''আবার পড়িব ?''

চপলা,—তোমার ইচ্ছা।

সত্যেন্দ্র,—তুমি কি বল !

চপলা,—আমার আর বলা বলি কি ? পড়তে তোমার আর কষ্ট কি ? বাবাকে টাকা দিতে হয় তাঁরই কষ্ট।

সত্যেন্দ্রের মুখ আরও গম্ভীর হইল। সে বলিল 'চপলা' তোমার যদি আমার সঙ্গে বিবাহ না হইত তাহা হইলে বোধ হয় তুমি সুখী থাকিতে।”

চপলা,—কথা কহিল না।

সত্যেন্দ্র.—বলিল 'আমিও তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য কাহারো পায়ে ধরিয়া সাধি নাই। অন্যত্রে বিবাহ হইলে বোধ হয় আমিও সুখী হইতাম।' চপলা এবার উঠিয়া বসিল, সে বলিল কে তোমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল, সত্যেন্দ্র পুনরায় বলিল ;—আমি কালই বাড়ী যাইব।

চপলা,—যাওনা কেউতো তোমাকে ধরে বসে নাই।

সত্যেন্দ্র,—না কেউ ব'সে নাই সে কথা সত্য, কিন্তু চপলা! তোমার নিকট ভালবাসা না পেলেও আমি তোমাকে এত ভালবেসে ফেলেছি যে তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও স্থির থাকিতে পারি না। তাই তোমার নিকট এত লাঞ্ছিত হইয়াও এখানে আছি।'

চপলা বলিল,—থাকবে না তো যাবে কোথা ?

কুক্ষণে কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল সন্দেহ নাই। আকাশে কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল সেই শব্দে পৃথিবী চমকিয়া উঠিল। সভয়ে বিদ্যুৎ ছুটিয়া গিয়া মেঘের কোলে লুকাইল।

চপলা সম্মুখে চাহিল দেখিল সত্যেন্দ্র নাই। কথাটা বলিয়া তাহার মনে হইল বড় খারাপ কথা বলিয়াছি। সে গৃহমধ্যে এদিক ওদিক দেখিল তাহার পর বাহিরে আসিয়া চারিদিকে চাহিল তাহার মনে হইল, যেন অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে সে শুইয়া পড়িল কিন্তু নিদ্রা হইল না।

৩

প্রভাতে হরেন্দ্রবাবু সমস্ত শুনিয়া সত্যোন্দ্রের সন্ধানে অনেক লোক পাঠাইলেন। কলিকাতার বাসাতেও লোক ছুটিল কিন্তু কেহই সত্যেন্দ্রের সংবাদ দিতে পারিল না। চপলা শুনিতে পাইল সত্যেন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পিতামাতা-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সে দিন আর হারমোনিয়াম বাজাইল না। একবার লেস্ প্রস্তুত করিতে গেল কিন্তু তাহাতে ভুল হইতেছে দেখিয়া রাখিয়া দিল। তাহার পর পুস্তক লইয়া বসিল। কিন্তু পুস্তকও ক্রমশঃ ভারি হইয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল পুস্তক হইতে দৃষ্টি ঊর্দ্ধে উঠিল। চন্দ্র দেখিল, তারা দেখিল, অসীম অনন্তআকাশ দেখিল, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। শেষে শয্যায় শুইয়া উপাধানে মুখমণ্ডল রক্ষা করিয়া ভাবিতে লাগিল।

অভাবে না পড়িলে মানুষ জিনিসের মূল্য বুঝিতে পারে না এই দুঃখ।

৪

চপলার নিকট উপেক্ষিত হইয়া সত্যেন্দ্র সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল। তাহার নগ্ন পদ, অনাবৃত মস্তক তথাপি শ্রান্তি নাই এক মাইল দুই মাইল করিয়া সেই রাত্রিতে সে পঞ্চদশ মাইল পথ অতিক্রম করিল।

তাহার পর রাত্রি প্রভাত হইল। কোথায় যাইবে কিছু স্থির করিতে পারিল না তাহার নিকটে ৫০৲টি টাকা ছিল সেই অর্থ সাহায্যে বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই সামান্য অর্থে কিছুদিন চলিল। তাহার পর ভিক্ষা না করিলে আর দিন চলে না। অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটিল। শেষে তাহার শরীরে আর এত কষ্ট সহ্য হইল না। হঠাৎ তাহার অসুখ হইয়া পড়িল।

এই কাশীবাসের সময় তাহার একটী বন্ধু মিলিয়াছিল তাহার নাম নবীনচন্দ্র। নবীন বিমাতার কর্কশ ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিল। এখন এই রুগ্নশয্যায় নবীনই সত্যেন্দ্রের একমাত্র সহায়। সে সর্ব্বদা সত্যেন্দ্রের কাছে থাকিয়া সেবা করিত।

সত্যেন্দ্রের জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। একদিন সে নবীনকে বলিল একটু কাগজ আর দুয়াত কলম দাও আমি একখানি পত্র লিখিব।

নবীন কাগজ প্রভৃতি দিলে পর সত্যেন্দ্র পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কত লিখিল কত কাটিল, চক্ষের জলে কত অক্ষর ভাসিয়া গেল, পরে পত্র শেষ করিয়া শিরোনামা লিখিয়া নবীনকে ডাকঘরে পত্রখানি দিয়া আসিতে বলিল। নবীনচন্দ্র বন্ধুর পত্র লইয়া চলিল।

তখন ভাদ্র মাস। সেদিন গঙ্গার 'ষাঁড়াষাঁড়ী' বাণ ডাকিবার দিন। গঙ্গার ধারে পথের লোকের জনতা ভেদ করিয়া যাইতে নবীনের বিলম্ব হইল। ডাকঘর হইতে ফিরিবার সময় দেখিল তখন বাণ আসিয়া পড়িয়াছে। দুইকূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। কতকদূর আসিয়া সম্মুখ পানে চাহিয়া সহসা নবীন বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া গেল। একি? কোথায় তাহাদের কুটীর? কোথায় তাহার রুগ্নশয্যাশায়িত বন্ধু সত্যেন্দ্র।

গঙ্গার জলে সেইস্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনার বিপদের আশঙ্কা না করিয়া সে ভরা গঙ্গায় লাফ দিল। কুটীরের নিকটে গিয়া অনেক খুঁজিল কিন্তু বন্ধু মিলিল না।

৫

স্বামী পরিত্যক্তা পিতামাতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা চপলা, একদিন দুইদিন করিয়া দুইমাস কাটাইল। এখন সে বুঝিয়াছে স্ত্রীলোকের সংসারে স্বামীই অবলম্বন। পিতামাতা শৈশবের সহায়; যৌবনের অবলম্বন স্বামী। এখনো চপলা পিতামাতার একমাত্র আদরিণী কন্যা। এখনো তাঁহারা তাহাকে সেইরূপই স্নেহ করেন, তবু কেন যে মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রের কথা লইয়া তাহাকে তিরস্কার করেন, আবার তাহার ছল ছল চক্ষু দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যান।

চপলার এখনো পূর্ব্বের সবই আছে তবু যেন কিছুই নাই। তাহার আর সাজসজ্জা নাই, সেই কোকিললাঞ্ছিত কণ্ঠস্বর স্বরবিহীন, মিষ্টকণ্ঠ থাকিলেও এখন তাহা আর তেমন মধুর রাগিণী আলাপ করিতে পারে না। কিম্বা রাগিণী খেলিলেও তাহা তত মিষ্ট লাগে না। সে এখনও দুই একবার গান গাহিতে

যায়—কিন্তু গান মনে হয় তো সুর হয় না, আবার সুর হয়তো গান ভুলিয়া যায়। অসমাপ্ত কার্পেট আসনখানি মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, ক্রুশ, কাঁটা, উল, লেস প্রভৃতি কোথায় কি আছে তাহার ঠিক নাই। দুই একখানা পুস্তক এদিক ওদিক পড়িয়া আছে, কিন্তু যত্ন না পাওয়ায় তাহাতে উই ধরিয়াছে।

চপলা এখনো তেম্নি সুন্দরী কিন্তু তাহার যেন আর সে উজ্জ্বলতা নাই, কেশদাম তেম্নি তরঙ্গায়িত, কিন্তু বিন্যাসের অভাবে যেন রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। মুখমণ্ডল তেম্নি সুন্দর কিন্তু তাহাতে হাসি নাই। নয়নদ্বয় তেম্নি উজ্জ্বল কিন্তু তাহাতে যেন একটা উদাস-নিস্প্রভ দৃষ্টি বাহির হইতেছে।

ভাদ্রমাসের মেঘের পানে চাহিয়া চপলা কি ভাবিতেছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্র পাইয়া চপলা এমন করে কেন? তাহার হাত কাঁপে কেন? চক্ষুদ্বয় আপনাপনি মুদিত হইয়া আসে কেন? ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়ে কেন? পত্রখানি হাতে করিয়া সে বসিয়া পড়িল ইহারই বা কারণ কি?

পত্রখানি খুলিয়া চপলা পড়িতে লাগিল।

বারাণসী।

"চপলা! অনেকদিনের পর আজ আবার তোমাকে পত্র দিলাম। ইচ্ছা হয় পড়িও নহিলে পোড়াইয়া ফেলিও।

এখন আমি বারাণসীধামে বিশ্বেশ্বরের চরণাশ্রিত। এখন ভিক্ষা আমার জীবিকা, তরুতল আমার বাসভূমি, তবুও একবার তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্বেও ইচ্ছা হইত, কিন্তু আজ সেই ইচ্ছা বড় বলবতী। তাহার কারণ আজ আমি রুগ্নশয্যায়

শায়িত। এখানে একটী বন্ধু পাইয়াছি, তিনি দিবারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন, তাঁহার জন্য কোন কষ্ট পাই নাই। তবুও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় কেন? অনেকবার সেই ইচ্ছা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু স্মৃতি বেগবতী উচ্ছ্বাসময়ী নদীর মত আমার সমস্ত চেষ্টাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় লইয়া যায়? আমি অবসন্ন-প্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আমি আজ বড় দুর্ব্বল। বাঁচিবার আশা নাই, আর সাধও নাই। যাহার সব ফুরাইয়াছে, তাহার আর বাঁচিবার সাধ কেন? যদি বাঁচি একবার তোমাকে দেখিয়া আসিব কিন্তু দূর হইতে, কি জানি যদি আমাকে দেখিলে তোমার কষ্ট হয়? যদি বাঁচি, আবার পত্র দিব, নহিলে এই শেষ। চপলা বিদায় আজ আসি ইতি—

হতভাগ্য—সত্যেন্দ্র।”

পত্রখানি পড়িয়া বালিকার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে পত্রখানি বুকে রাখিয়া উপাধানে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। গৃহিণী কক্ষমধ্যে আসিয়া দেখিলেন, চপলা মুখ গুঁজিয়া আছে। তিনি তাড়াতাড়ি কন্যাকে কোলে লইয়া দেখিলেন, চক্ষের জলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছে।

জননীকে দেখিয়া চপলা স্বামীর পত্রখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। তিনি পত্রখানি দেখিয়া বুঝিলেন, সত্যেন্দ্র এই পত্র লিখিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সত্যেন্দ্রের ঠিকানা জানিয়া হরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন।

হরেন্দ্রবাবু সেই রাত্রেই কাশী যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া বহু কষ্টে নবীনচন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন কিন্তু ইহাতে

তাঁহার সব আশার শেষ হইল। তিনি শুনিলেন, সত্যেন্দ্র গঙ্গায় ভাসিয়া গিয়াছে।

চপলাও এ কথা শুনিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া নবীনা যুবতী প্রায়শ্চিত্তের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিল।

গঙ্গার বাণে রুগ্ন সত্যেন্দ্র ভাসিয়া গেল সে সন্তরণ পটু ছিল কিন্ত অনেকদিনের উপবাসে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রবল তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিল না। সে স্রোতের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

নদীর উপর একখানি নৌকা ভাসিতেছিল, আরোহীগণ উন্মাদিনী নদীর উপর সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া তীরবেগে নৌকা আনিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। তখন তাহার আর কোন সংজ্ঞা ছিল না।

যখন চৈতন্য হইল, সত্যেন্দ্র দেখিল—একটি অপরিচিত কক্ষে সে একটি শয্যায় শায়িত। তাহার চারিদিকে অপরিচিত জনকয়েক লোক বসিয়া আছে। ক্রমে সে জানিতে পারিল, এক ধনী ব্যক্তি নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, নদীবক্ষ হইতে তিনিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

কিছুদিন তথায় থাকিয়া সত্যেন্দ্র তাহার জীবনদাতার অনুমতি লইয়া তথা হইতে পুনরায় যাত্রা করিল।

৬

আজ বিজয়া দশমী। পিতামাতাকে ভোজন করাইয়া যোগিনী চপলা একাকিনী নিজ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। বাতায়ন-পথ উন্মুক্ত করিয়া যে পথে সত্যেন্দ্র গিয়াছে, সেই পথ-পানে চাহিয়া রহিল। কত কল্পনা আসিল, কত ভাসিয়া গেল;

বালিকা কত কাঁদিল, তাহার পর সন্তাপহারিণী নিদ্রার কোলে আশ্রয় লাভ করিল।

নিদ্রাবেশে যে স্বপ্ন দেখিল সে যেন কাশী গিয়াছে। তথায় জাহ্নবী-কূলে এক বটবৃক্ষমূলে দেখিল, এক সন্ন্যাসী। বালিকা তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল সে সত্যেন্দ্র। অপরাধিনীর মত চপলা তাহার পদদ্বয় ধরিতে গেল। চপলাকে দেখিবামাত্র সত্যেন্দ্রও যেন ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। চপলাও কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। অনেকদূর গিয়া একটি ছোট নদী দেখিতে পাইল। সত্যেন্দ্র এক লাফে নদী পার হইয়া গেল, চপলা পারিল না। তখন সে কান্দিতে লাগিল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—আমায় দয়া কর, কখনো কোন অপরাধ করিব না।

সহসা কাহার কণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে দেখিল, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। সেই অন্ধকারে চপলার নয়নের জ্যোতি ভাসিয়া উঠিল দেখিল,—সে 'সত্যেন্দ্রনাথ।'

সত্যেন্দ্র বলিল,—চপলা! আমায় ক্ষমা কর।

বালিকার মুখে কথা সরিল না। তাহার অবশ মস্তক সত্যেন্দ্রের বুকের উপর পড়িল, সে জড়িতস্বরে বলিল,—"আমায় ক্ষমা।"

বালিকার চক্ষে তখন অবিরল ধারে অশ্রু বহিয়া সত্যেন্দ্রের বক্ষস্থল সিক্ত করিতেছিল। সত্যেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া ডাকিল,—চপলা! আমার চপলা। চপলা কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল অশ্রুপূর্ণ চক্ষে সত্যেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

—— ০:*:০ ——



পথিক।

সন্ধ্যাকাল। বৈশাখের তপ্ত সূর্য্য পশ্চিমদিগন্তে ডুবিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আসিয়া রক্ত-করোজ্জ্বল নদী সৈকত ও উপত্যকাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আমি পথ অতিক্রম লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই হাস্যবিকসিত মুখে চিন্তার ছায়ার মত দুই এক খণ্ড মেঘ নীল আকাশের কোলে খেলিয়া বেড়াইতেছিল। রজনীর গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে মেঘও ক্রমশঃ ঘনতর হইয়া আসিতে লাগিল। সম্মুখে রাত্রি, মাথার উপর মেঘ দেখিয়া পথিকের কিরূপ ভয় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমার গন্তব্য স্থান এখনও অনেক দূর। মধ্যে আশ্রয় পাইবার স্থান ছিল না। পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র নদী, ফিরিয়া যাইবারও উপায় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল মধ্যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে; সুতরাং সেই স্থানেও থাকিতে পারিলাম না। অগত্যা আমায় পথ চলিতে হইল।

এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা আসিলাম। আকাশের পানে চাহিতে সাহস হইল না। এমন সময় সোঁ সোঁ শব্দে বায়ু বহিল। পবনের আকস্মিক গর্জ্জনে চকিত হইয়া আকাশপানে চাহিলাম। কি ভয়ানক, মেঘ যেন মাটিতে আসিয়া পড়িতেছে। শোণিত-লোলুপা অসির মত তাহার মাঝে বিদ্যুত চমকিতেছে। আকাশে

চন্দ্র নাই। নক্ষত্রসমূহ যেন ভয়ে লুকাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত জগৎ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। উপত্যকায় বৃক্ষসমূহ, আকাশভেদী শৈলমালা সকলকেই যেন সর্ব্বগ্রাসিনী নিশা গ্রাস করিয়াছে। বাতাসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ছুটিতেছি, এমন সময় আমার পায়ে একটা আঘাত লাগিল। আমি পড়িয়া গেলাম। সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিল, দেখিলাম একটা নরমূর্ত্তি। তাহাকে দেখিবামাত্র "ঠাকুরমার সেই পুরাতন ভূতের গল্প মনে পড়িয়া গেল। সভয়ে 'রাম' 'রাম' বলিয়া আমি দৌড়িবার উপক্রম করিলাম। এমন সময় ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "মা গো"। তাহার সেই দীর্ঘশ্বাস কম্পিত কাতর আর্ত্তনাদ কাণে বাজিবা মাত্র আমি দাঁড়াইলাম। একবার পশ্চাতে চাহিলাম তখন আর বোধ হয় আমার ভূতের ভয় ছিল না। আমি ভাবিলাম বাস্তবিক যদি এ মানুষ হয়। এই দুর্য্যোগে এ ঝঞ্ঝায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে কেন? আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম,—একটী নর-মূর্ত্তি একটী ঝোপের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ডাকিলাম,—কে তুমি?

আমার কথায় সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া—জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? তাহার কথায় ও ভাবে বুঝিলাম, লোকটাও আমার মত ভয় পাইয়াছে। অন্ধকার মরণের সম্মুখে ঈষদা-লোকিত জীবনের শেষ সীমায় যে দণ্ডায়মান, কিম্বা যাতনায় উৎপীড়িত হইয়া যে দিবারাত্রি মৃত্যুর কামনা করিতেছে, সেও মৃত্যুকে ভয় করে।

আমি বলিলাম,—আমি মানুষ। তুমি এমন করিয়া পড়িয়া কেন?

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এমন সময় ঝটিকা-আলোড়িত বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি দেখা গেল। ভাবিলাম নিকটে গ্রাম আছে।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি আমার কাঁধে ভর দিয়া যাইতে পারিবে?

সে বলিল,—যদি অনুগ্রহ করেন চেষ্টা করিয়া দেখি।

সে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। মৃত্তিকা হইতে প্রায় একহস্তপরিমিত উচ্চে উঠিয়া আবার পড়িয়া গেল।

তাহার কাতর ক্রন্দনে আমার বড় দয়া হইল। আমি বলিলাম,—উপায়?

সে দৃঢ়ভাবে বলিল,—উপায় আছে, ভাই! দয়া করিয়া করিবে কি? এই বলিয়া সে আমার পা জড়াইয়া ধরিল।

আমি তাহার হাত সরাইয়া বলিলাম,—বলনা ভাই, এই বিপদে তুমি আমার বন্ধু. আমিও তোমার বন্ধু। বল, আমায় কি করিতে হইবে?

সে অকম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"তোমার হাতে লাঠি আছে। আমার মাথায় মার। বিধাতার অনেক মার খাইয়াছি, কিন্তু এ প্রাণ বাহির হয় নাই। সংসারের আঘাত অনেক সহ্য করিয়াছি, তবুও বুক ফাটে নাই। কিন্তু যদি এই শ্রান্ত ক্লান্ত মৃতকল্প অবস্থায় মৃত্যু সম্ভব হয় আমায় মারিয়া ফেল।"

সে আমার পায়ে ধরিয়া আবার বলিল,—মার ভাই আঘাতে আমার মাথা চূর্ণ হইয়া এই ঝটিকা তাড়নে দূরে মিশিয়া যাক্।

পৃথিবীতে কেহ আমার জন্য কাঁদিবে না, আমার মৃত্যুতে সংসারের কোন ক্ষতি নাই।

আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। মাথার উপর সোঁ সোঁ শব্দে ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল। দূরে আকাশ-কোলে ঘন কৃষ্ণ কাদম্বিনীর বিশ্বত্রাসী কড় কড় নাদে উপত্যকা কম্পিত হইতেছিল। সে আবার বলিল—এস ভাই তোমার অনন্ত পুণ্য হইবে। নরহত্যা মহাপাপ বটে, কিন্তু আমার মত হতভাগ্যকে হত্যা করায় পাপ নাই। আমার যাতনার অবসান কর। আমার অজ্ঞাতসারে জানি না কখন দুই বিন্দু অশ্রু আমার নয়নে ঝরিয়াছিল। তাহাকে আর কিছু বলিবার অবসর দিলাম না। কোন আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সেই অন্ধকারে ঝটিকার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এক আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম।

এইরূপে প্রায় ১৫ মিনিট আসিবার পর বিদ্যুতের আলোকে দেখিলাম, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড নদী। ভাবিলাম—সর্ব্বনাশ কি হইবে? এই আলোক কোথা হইতে আসিল? তবে কি নদীবক্ষে বিদ্যুতের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আলোক মনে করিয়াছিলাম। মরীচিকা কখনও দেখিনাই। পুস্তকে পড়িয়াছি—সৌরকর-ঝলসিত বারিবিহীন মরুক্ষেত্রে মরীচিকা দেখা যায়। আমি কি গভীর অন্ধকারে নদীবক্ষে আলোক-মরীচিকা দেখিলাম!

সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় পার্শ্বে আর একটী আলোক দেখা গেল। আর মনে হইল কে যেন দূরে গম্ভীর কণ্ঠে মল্লার রাগিণীতে একটী গান গাহিতেছে।

আপনারা কি কেহ কখনও এইরূপ অন্ধকারে একটু আশ্রয়ের জন্য লালায়িত হইয়াছেন? কখনও কি নদীবক্ষে বিদ্যুৎদীপ্তি

দেখিয়া আলোকভ্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া আশাভ্রষ্ট হইয়াছেন? পরে আবার সেই নির্জ্জনে, সেই গম্ভীরনাদী নদীকূলে মনুষ্যের কণ্ঠ শুনিয়াছেন? যদি এই অবস্থায় কেহ কখনও পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, তখন আমার মনের ভাব কি হইয়াছিল। আমার মনের ভাব আমি বুঝাইতে পারিলাম না। তখন আমি ভয়ে, হতাশে, উদ্বেগে, বিস্ময়ে, আশায় ও আহ্লাদে অধীর হইয়াছিলাম।

আমি তাহাকে পৃষ্ঠে করিয়া সেই নদীর ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। নদীর তখন কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! উহা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকে ধরিয়া উদর পূরণ করিবার জন্য তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে লোলুপ তরঙ্গ বিস্তার করিতেছিল। আমার ভয় হইল। আরও দূর দিয়া যাইতে লাগিলাম।

সঙ্গীত ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। আমি অনেক গান শুনিয়াছি। কিন্তু এত সুন্দর হৃদয়প্লাবিনী রাগিণী কখনও শুনি নাই। সমস্ত বনভূমি মুখরিত করিয়া নদীসৈকতের উপর দিয়া দূর পরপারে তাহার প্রতিধ্বনি বাজিতে ছিল।

আমরা আলোকের নিকটে আসিলাম। দেখিলাম, একটী বিস্তৃত শাখাশোভিত তমালবৃক্ষের তলদেশে এক সন্ন্যাসী অজিনাসনে উপবিষ্ট। হোমালোকে তাঁহার মুখমণ্ডল যেন রক্তবর্ণ। দীর্ঘ জটাকলাপ পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে লম্বিত। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র আমার "কপালকুণ্ডলা"র কাপালিকের কথা মনে হইয়া গেল। ভয়ে মনে মনে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলাম। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে "নবকুমারের" সমস্ত জীবন মনে পড়িয়া গেল।

যাহা হউক সন্ন্যাসী কাপালিক নহেন বুঝিলাম। তিনি পূজা সমাপ্ত করিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটস্থ কুটীরে আশ্রয় দিলেন, এবং আহার করিবার জন্য কতকগুলি চিঁড়ে, এক হাঁড়ি দুগ্ধ ও কতকটা গুড় দিলেন। চিঁড়ের উপর কখনও আমার ভক্তি ছিল না, কিন্তু সেদিন দেখিলাম, অভক্তি অপেক্ষা ক্ষুধার শক্তি অধিক। উদর পূরণ করিয়া উভয়ে আহার করিয়া অগ্নির সম্মুখে বসিলাম। পার্শ্বে একখানি কম্বল বিস্তৃত ছিল। শীত ভাঙ্গিবার পর উভয়ে সেই কম্বলে বসিলাম।

এতক্ষণ পরে দুইজনে কথাবার্ত্তার সময় পাইলাম। পূর্ব্বে তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার জীবনী শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—ভাই তোমার নাম কি?

সে বলিল,—আমার নাম "পথিক" এইমাত্র জানিও। আমার উদ্বেগ আরও বাড়িল। আমি বলিলাম,—যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে তোমার দুঃখের কথা আমায় বল। তোমার ইতিহাস শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে।

আপত্তি আর কি? তবে ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও কখনও জীবনের কথা বলি নাই। এবার বুঝিতেছি দিন নিকট হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমার কৌতূহল আমি নিবারণ করিব। শুনিয়া যাও—

এই বলিয়া পথিক আরম্ভ করিল, "চব্বিশ পরগণা জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গৃহে আমার জন্ম। আমার পিতা সেই পল্লীগ্রামের জমীদার। আমার একটি অগ্রজ ভ্রাতা ও দুইটি ভগ্নী আছেন। আমিই আমার পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান।

আমার অগ্রজ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। সেই

বাল্যকাল হইতে আমার শিক্ষার ভার পিতার উপর পড়িয়াছিল। পাঠে আশাতীত উন্নতি দেখিয়া বাবা এবং মা আমায় বড় ভালবাসিতেন। যখন আমার বয়ক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর তখন আমি প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি।

কলিকাতায় আমাদের একখানি বাড়ী আছে, আমাকে পড়াইবার জন্য বাবা কলিকাতার বাড়ীতে আনিলেন। আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য গাড়ীঘোড়া ক্রীত হইল। আমার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে আর আমি ভাল করিয়া কলিকাতা দেখি নাই। যদিও দুই একবার আসিয়াছিলাম, গঙ্গার ঘাট আর কালীবাড়ী, তাহাও আবার যাতায়াতের সময় মেয়েদের সহিত গাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করিয়া 'বস্তাবন্দী'র মত যাইতাম আর তথায় উপস্থিত হইয়া গাড়ীতেই বসিয়া থাকিতাম। এই পর্য্যন্ত আমার কলিকাতা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় সেই সাবধানতার আবরণ উন্মুক্ত হইল,—আমি ভাল করিয়া এই মহানগরীর দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম—উন্নতিশীল ধনীবৃন্দের অগণিত পর্ব্বতপ্রমাণ সৌধশ্রেণী, বিস্তৃত রাজপথে কর্ম্মব্যস্ত লোকারণ্য। দেখিলাম মনুষ্যসমূহ দিবারাত্রি ছুটিতেছে। কাহারও পার্শ্বে চাহিবার অবকাশ নাই। এখানে পল্লীগ্রামের জড়তা নাই। এখানকার লোকে অপরের চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করে না। কেবল কার্য্য, কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। সমস্ত নগরীখানি যেন কর্ম্মময়ী। আমার মনে বড় উৎসাহ হইল। তখন আমার কার্য্য অধ্যয়ন। পাঠে দ্বিগুণ উদ্যম বাড়িল। বর্ষের শেষে আমি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। মা ও বাবা আমায় কত আদর করিলেন।

পিতামাতার স্নেহাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

একে একে দিন কাটিতে লাগিল। পরীক্ষার সময় নিকটে আসিল। আমি পরীক্ষা দিলাম।

এই বলিয়া পথিক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। তাহার মুখপানে চাহিলাম। তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত।

পথিক বলিল,—"সুখের দিন শেষ হইল, শুন এবার আমার দুঃখের কাহিনী—।"

আমি বলিলাম, "পূর্ব্ব কথা স্মরণে যদি কষ্ট বোধ হয় তবে আজ আর না, অন্য দিন শুনিব।"

সে আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। এ কি হাসি?—এ হাসি আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গমের পূর্ব্বে তাহার সূক্ষ্মশৃঙ্গের ক্ষণেক প্রজ্জ্বলনের মত ভীষণ, কাদম্বিনীর কড়মড় নিনাদের পূর্ব্বে বিদ্যুৎ চমকের মত—তীব্র, স্তব্ধ জগতের ভীষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে বিশ্বলয়কারী অগ্নির আকস্মিক বিকাশের পূর্ব্বে ধূম উদ্গীরণের মত ভয়ানক। সে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—যে দুর্ঘটনা বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছি, তাহা আবৃত্তি করিতে এ বুক ফাটিবে না। কিন্তু পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল হও, নহিলে আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে, পর্ব্বতের মত কঠিন হও, নহিলে আমার কথায় তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে, আকাশের মত উদার হও, নহিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইবে।

আমার আর কথা কহিবার সাহস হইল না। সম্মুখে হুহু শব্দে অগ্নি জ্বলিতে ছিল, বাহিরে কড় কড়নাদে মেঘগর্জ্জন

করিতেছিল। কুটীর মধ্যে আমরা দুইজন ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

সে বলিল।—

"পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে পড়া শুনা করিবার কিছু ছিল না। একদিন জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইলাম। তাহার পূর্ব্বে আর আমি কখনো থিয়েটার দেখি নাই। এক গায়িকার একটি সঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হইলাম। অভিনয় সমাপ্ত হইলে সকলে বাড়ী আসিলাম। গানটী কিন্তু আমি ভুলিতে পারিলাম না। সেই মোহিনী ঝঙ্কার যেন সর্ব্বদা আমার কাণে বাজিতেছিল। আবার সেই গান শুনিতে ইচ্ছা হইল। একটী বন্ধুর নিকট সেই কথা বলিলাম। সে আমাকে লইয়া গায়িকার ভবনে গান শুনিতে গেল। তথায় গিয়া দরজায় পা দিয়া আমার বুক কাঁপিতে লাগিল; মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হইল, আমি ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেলাম। আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, বুকের মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রবল দ্বন্দ্ব বাজিল। শেষে গায়িকা আসিয়া ইচ্ছার পক্ষ সমর্থন করায় ইচ্ছারই জয় হইল, গায়িকা আমার হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া বসাইল। আমি তাহার গান শুনিলাম ভিজিলাম—মজিলাম—একেবারে ডুবিয়া গেলাম। পিতা মাতার বহু আশার মূলে কুঠারাঘাত করিলাম আর আমার আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিলাম।

কিছুদিন পরে পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইল আমি বৃত্তি পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পিতামাতার আহ্লাদ আর ধরে না। তাঁহারা তখন জানিতেন না যে তাঁহাদের প্রবঞ্চক পুত্র অধঃপাতে গিয়াছে। কলেজে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু এবার আমার গাড়ী

কলেজের সম্মুখে না দাঁড়াইয়া গায়িকার দ্বারে দাঁড়াইত। আমি চারিটা বাজিবার পর কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতাম। মানুষ মানুষের চক্ষে ধূলা দিতে পারে; ঈশ্বরের চক্ষে পারে না। সংসর্গ দোষজনিত একটা ঘৃণিত ব্যারামে আমি আক্রান্ত হইলাম। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। যাহা হউক বাবা অল্পদিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, আমি অধঃপাতে গিয়াছি।

কলিকাতার পনের মাইল পূর্ব্বে আমাদের জমীদারী আছে। সংশোধনের নিমিত্ত বাবা আমাকে তথায় লইয়া গেলেন। তিনি আমার নিকটেই রহিলেন। কিন্তু গত ছয় মাসের মধ্যে একেবারে অধঃপতনের চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছিলাম; আমি আমার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রকে সংযত করিতে পারিলাম না। তথায় এক কুলীন ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সেই বন্ধুর এক বিবাহিতা অথচ স্বামীপরিত্যক্তা ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা ভগ্নী ছিল। আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিলাম। আমাদের পাপের ফলস্বরূপ তাহার একটি পুত্র হইল। আমি পিশাচ! সেই সূতিকাগারে প্রসূতীর সম্মুখে সদ্যপ্রসূত সন্তানকে হত্যা করিলাম।”

পথিকের কণ্ঠস্বর কম্পিত শুনিয়া তাহার পানে চাহিলাম। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছিল। উদ্বেলিত সমুদ্রের হুহুঙ্কারের মত তাহার দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, তাহার করদ্বয় তখন দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ।

“বাবা শুনিলেন, আমাকে বাড়ীতে লইয়া গেলেন। স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য বিবাহ দিলেন। কিছুদিনের জন্য আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইল। আবার আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রিয়তমা ভার্য্যার অমায়িক আচরণে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যখন সমস্ত পল্লীখানি নিশীথে ঘুমাইয়া পড়িত, আমি তাহার সহিত

ছাদে উঠিতাম—দেখিতাম সেই তরঙ্গিণী সেইরূপ মৃদুকলনাদিনী, বৃক্ষসমূহ সেইরূপ ফলপুষ্প সুশোভিত, বিস্তৃত মাঠ সেইরূপ শস্য শ্যামল। সেই দেখিয়া আর আমার অধঃপতনের কথা মনে করিয়া আমি মনে মনে কতই লজ্জিত হইতাম। আমার স্ত্রী আমায় কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য কত যত্ন করিতেন। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর ছাদ হইতে নামিয়া প্রিয়তমার কোমল ভুজবল্লীতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন রাত্রে (তখন বোধ হয় নয়টা বাজিয়াছিল) আমি একাকী বাহিরের ঘরে বসিয়াছি, সম্মুখে বাতি জ্বলিতেছিল। একখানি "ম্যাকবেথ" আমার হাতে ছিল। আমি সেই সদ্যপ্রসূত সন্তানহত্যার কথা ভাবিতেছিলাম। বাহিরেও তাই এইরূপ অন্ধকার সেই রাত্রি! এমনই চক্ষু ঝলসিত করিয়া সেদিনও কালমেঘে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল, এমনই কড়কড়নাদে সেদিনেও মেঘ ডাকিতেছিল। আমি অতীত কথা ভাবিতেছিলাম। সহসা দেখিলাম, অর্দ্ধ উন্মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে একটী রমণী-মূর্ত্তি। বিদ্যুতালোকে তাহার অস্পষ্ট ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে সেই রাক্ষসী,—যে সয়তানী উপপতির দ্বারা সূতিকাগৃহে আপন সদ্যপ্রসূত পুত্রকে হত্যা করাইয়াছিল। তাহার বুকে যেন সেই সন্তানের ছবি দেখিলাম। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। পুস্তক হাত হইতে পড়িয়া গেল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া যাইলাম।

যখন সংজ্ঞা পাইলাম, দেখিলাম রাক্ষসীর বুকে আমার মাথা রহিয়াছে। যে পিশাচী অকম্পিত বক্ষে নির্ণিমেষ নেত্রে পুত্রহত্যা দেখিয়াছে, আবার আমি তাহার কবলিত হইলাম, আবার

ডুবিলাম। এক বৎসর সেই কুহকিনীর কুহকাবরণ আমার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিল। তাহার পর যখন পিশাচীর আচরণে আমার চমক ভাঙ্গিল, তখন আবার একবার সংসারের পানে চাহিলাম। কি দেখিলাম—দেখিলাম করুণ দৃশ্য। আমার সোণার সংসার একটা মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা উদ্বন্ধনে গতপ্রাণা, স্নেহময়ী জননী রুগ্নশয্যাশায়িনী, পিতা চিন্তাক্লিষ্ট, ভ্রাতা আমায় দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন। ভ্রাতৃজায়া ও ভগ্নীগণ আমার সহিত কথা কহিলেন না। আমায় দেখিয়া বাবা "দূর দূর" করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মাকে দেখিতে পাইলাম না। বড় ইচ্ছা হইল তাঁহাকে একবার দেখিব। সকলকে কত অনুরোধ করিলাম—কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিল না। বাবার পদতলে পড়িলাম। তিনি পাদুকা প্রহার করিতে করিতে দূর করিয়া দিলেন। দ্বারবানের নিকটও অপমানিত হইলাম। তবুও মাকে দেখিবার ইচ্ছা গেলনা। বাড়ীর পাশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম। বাড়ীর যে সব লোক আমায় দেখিয়া ভয়ে মাথা নোয়াইত, আজ তাহারা আমাকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন শেষ রাত্রে (বাবা যে সময় বাগানে বেড়াইতে আসিতেন) আসিয়া নির্জ্জনে বাবার পায়ে ধরিয়া বলিলাম,—বাবা আমায় একবারমাত্র মাকে দেখিতে দিন, তারপর যা দণ্ড দিবেন গ্রহণ করিব। একবার ভিন্ন আর মাকে কখনও দেখিতে চাহিব না। এইবারের মত আমায় মাকে দেখান। বাবা কথা কহিলেন না। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া ঘোড়ার চাবুকের দ্বারা আমায় প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ফাটিয়া রক্ত

ছুটিতে লাগিল! এমন সময় দূরে দেখিলাম, মা আমার দুই ভগ্নীর স্কন্ধে ভর দিয়া তথায় আসিতেছেন। আমি তখন মাটিতে পড়িয়াছিলাম। আমার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত দেখিয়া মুমূর্ষু জননী অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার মাথা তাঁহার কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার দুর্ব্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপত্যস্নেহের বলে পূর্ণ হইয়াছিল। আমি বিস্ফারিত নয়নে জননীর সেই মহিমাময়ীমূর্ত্তি দেখিলাম। আর তাঁর পীযূষ বাণী শুনিলাম। সহস্র বেত্রের বিষাক্ত বেদনা আর আমার অনুভব হইতে ছিল না।

প্রায় পাঁচ মিনিট সব নীরব। বাবা চুপ্ করিয়াছিলেন। বেত্র হস্তে দাদা স্থির। করুণা পূর্ণ স্নেহসজল নয়না ভগ্নীদ্বয় নীরব, হতভাগ্য আমি মার কোলে সংজ্ঞাহীন।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সহসা মা পড়িয়া গেলেন। তাঁহার লুণ্ঠিত মস্তক আমি আমার কোলে লইলাম। এই সমস্ত শেষ হইল। মা স্বর্গধামে চলিলেন। আমি মার মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া একাকী শ্মশানাভিমুখে চলিলাম, কেহ আমার প্রতি চাহিতে সাহস করিল না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া চিতা ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিলাম। তাহার পর এই প্রায়শ্চিত্তের জন্য বাহির হইয়াছি। এখন দারুণ শীতে অনাবৃত মস্তকে থাকা আমার ব্রত, রৌদ্রে বিনা কার্য্যেও ছুটিয়া বেড়ান আমার কর্ম্ম, যে কোনরূপে হউক জীবনকে কষ্ট দেওয়াই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

পথিক চুপ করিল। তাহার মুখ গম্ভীর, চক্ষু স্থির, একটী দীর্ঘ নিশ্বাসেও তাহার বক্ষস্থল কম্পিত হইতেছিল না।

বাহিরে বৃষ্টির বেগ তখনও হ্রাস হয় নাই। আকাশ তেমনই ঘনকৃষ্ণবর্ণ, ভূমিচুম্বী মেঘমালা তেমনই গর্জ্জনশীল, প্রকৃতি তেমনই আলোড়িত।

পথিক বাহিরে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আসিল না দেখিয়া আমিও বাহিরে আসিলাম, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমার বোধ হইল যেন সে অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে, ভয়ার্ত্ত হইয়া ডাকিলাম, 'পথিক' নয়নদ্বয় ঝলসিত করিয়া বিদ্যুৎ ছুটিল। আমি আবার ডাকিলাম,—'পথিক'; মেঘ কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল, পথিক ফিরিল না।

প্রভাতে যখন আমি নদীতীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম তীরে একটী মনুষ্যের মৃত দেহ। ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম এই আমার সেই বন্ধু "পথিক"।

সন্ন্যাসীর সাহায্য লইয়া তাহার সংকার করিলাম। তাহার পরদিন সেই আশ্রম ত্যাগ করিবার সময় সেই হতভাগ্যের নির্ব্বাপিত চিতাপানে চাহিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম। আর যুক্তকরে উর্দ্ধনেত্রে ভূমে জানু পাতিয়া বলিলাম, "ভগবান্! হতভাগ্যের আত্মা যেন তোমার চরণে শান্তি পায়।"

